# কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

প্রকাশক
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স্
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদ

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহোদয়

শ্রীকরকমলেষু

# নিবেদন

আজ প্রায় একবৎসর হইতে চলিল **রসচক্র**-সংসদের রসজ্ঞ বন্ধুগণের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত সংসদের একটি অধিবেশনে পাঠ করি। এই প্রবন্ধটি শুনিয়া তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন এবং ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। রসিক বন্ধুগণের অনুরোধে কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি এবং রসচক্রের কয়েকটি অধিবেশনে ঐগুলি পাঠ করি। এবারও রসিক বন্ধুগণ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন এবং এই বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলিকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া একটি গ্রন্থে পরিণত করিতে অনুরোধ করেন। ইহা হইতেই গ্রন্থখানির উৎপত্তি। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্রপরিষদ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন এবং উক্ত পরিষদের দুইটি অধিবেশনে গ্রন্থখানির কতক অংশ পঠিত হয়। এই সূত্রে পরিষদের স্থায়ী সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয়। গ্রন্থখানি লিখিবার সময় রসচক্রের রসিক বন্ধুবৃন্দ এবং শ্রদ্ধাস্পদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য ইঁহাদিগকে আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থখানির মধ্যে রসবিচার এবং তত্ত্ববিশ্লেষণ দুয়েরই প্রয়াস আছে, তাই যাহার সারস্বত সাধনায় রসজ্ঞতা এবং মনীষার অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে, সেই পরম রসজ্ঞ এবং পরম তত্ত্বজ্ঞ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়কে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

৩২, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রীপঞ্চমী—১৩৩৭।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

# কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

## রূপ-জগৎ

### নিসর্গ

কোন কবিতার মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা থাকিলেই তাহা নিসর্গ-কবিতা হইয়া উঠে না।—তাহার মধ্যে চাই কবির সেই রসদৃষ্টি, সেই দরদ, সেই mood, সেই 'মেজাজ', সেই 'আপন মনের মাধুরী' যাহা প্রকৃতির মধ্যে একটি অপূর্ব্বতার সৃষ্টি করে। প্রকৃতির অবিকল বর্ণনায় নিসর্গ-কবিতার সৃষ্টি হয় না,—তাহার সহিত চাই সেই দরদটুকু, সেই রসানুভূতিটুক, সেই অনুরাগটুকু যাহা প্রকৃতিকে সুরময় করিয়া তুলে,- তাহার মধ্যে একটি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে।

'আপন মনের এই মাধুরীটি', এই অনুরাগটুকু মিশাইতে গিয়া কবি তাঁহার নিসর্গ-কবিতাকে করিয়া তুলেন হয় চিত্রধর্ম্মী, না হয় সঙ্গীতধর্ম্মী, না হয় ভাবধর্ম্মী।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

বর্ষার একটি বিশিষ্ট নিজস্ব রূপ আছে। এই রূপটি নানা ভাবে আমাদের মনের মধ্যে জাগিতে পারে। সে জাগিতে পারে বর্ষার গোটা-কতক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর দিয়া। যেমন,—

ওপারেতে বৃষ্টি এলো ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশ মাণিক জ্বালা॥

অথবা যেমন,—

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে।
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে॥

কবি এখানে বর্ষার গুটিকতক প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিয়া রূপতুলিকার দু-একটি টানে বর্ষার বিশিষ্ট রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিলেন। কবি এখানে চিত্রধর্ম্মী।

কিন্তু বর্ষার মধ্যে কেবল আকৃতিগত রূপই তো সবখানি নয়—তাহার বুকের মধ্যে সঙ্গীতও তো রহিয়াছে যথেষ্টই। সেই ধ্বনি, সেই সঙ্গীতও তাহার রূপ। তাহাকে আশ্রয় করিয়াও বর্ষার রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়।

যেমন,

ঐ আসে ঐ অতিভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে
ঘন-গৌরবে নব-যৌবনা বরষা
শ্যাম-গম্ভীর সরসা॥

এখানে বর্ষা ফুটিয়া উঠিল তাহার দৃশ্যমূর্ত্তিতে নয়,—তাহার স্বরমূর্ত্তিতে। বর্ষার বুকের মধ্যে মেঘ-মৃদঙ্গের যে জমাট গুরুগম্ভীর সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, ছন্দের বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়া কবি বর্ষার রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিলেন। কবি এখানে সঙ্গীতধর্ম্মী।

ইহা ছাড়া বর্ষার আর একটি রূপ আছে—সেটি তার ভাবময় রূপ। অর্থাৎ ইহা সেই রূপ, যে রূপে সে আমাদের মনের সহিত একাকার

হইয়া গিয়া নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে।—পৃথক্ করিয়া তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—কবির মনের সহিত একাকার হইয়া সে তাহারই মধ্যে নিঃশেষে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অস্তিত্ব একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় না ; তাহা তখন কবির সমস্ত মানসিক বৃত্তিগুলিকে নিজের রঙে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলে। কবি-হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি তখন তাহারই রঙে রঙিন হইয়া উঠে। সূর্য্যাস্তের ঠিক পরেই সূর্য্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু নদীর জলে, ঘন বনশ্রেণীর শীর্ষে, দিক-চক্ররেখার অঙ্গে অঙ্গে, এককথায় প্রকৃতির সকল দৃশ্যের মধ্যেই যেমন তাহার বর্ণাভাস পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি ভাবে প্রকৃতির বিশিষ্ট কোন রূপ কবির মনের অন্তরালে যখন নিজেকে হারাইয়া ফেলে, তখন তাহার অস্তগামী রশ্মি কবিহৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে নিজের রঙে রাঙাইয়া তুলে। যেমন,—

"আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো গেল রে দিন ব'য়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টি-ধারা ঝরছে র'য়ে র'য়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে,
কী ভাবি যে আপন মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে
কী কথা যায় ক'য়ে।
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে
খুঁজে না পাই কূল ;
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে
ভিজে বনের ফুল।

আঁধার রাতের প্রহরগুলি
কোন সুরে আজ ভরিয়ে তুলি
কোন ভুলে আজ সকল ভুলি
আছি আকুল হ'য়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টি-ধারা
ঝরছে র'য়ে র'য়ে॥

ইহার মধ্যে বর্ষা-সন্ধ্যার প্রাকৃতিক কোন রূপ আত্মপ্রকাশ করে নাই; অথচ ইহার মধ্যে আষাঢ়-সন্ধ্যার অবসাদময় নিরালা ক্ষণটুকু কি চমৎকার একটি রূপ ধরিয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? এই কবিতার মধ্যে আমরা আষাঢ়-সন্ধ্যার কথার চেয়ে কবির নিজের মনের কথাই বেশি করিয়া পাই; তবে ইহাকে আষাঢ়-সন্ধ্যার কবিতা বলি কিরূপে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতির একটি ভাবময় রূপ আছে। এখানে আষাঢ়-সন্ধ্যা সেই ভাবময় রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছে। এখানে আষাঢ়-সন্ধ্যা কবির মনের অন্তরালে আপনাকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অস্তগত সূর্য্যকে দেখা না যাইলেও তাহার বর্ণাভাস যেমন প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে, ঠিক তেমনি করিয়া আষাঢ়-সন্ধ্যা কবির মনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া থাকিয়া অলক্ষিতে কবিহৃদয়ের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতির উপর আপনার সজল-স্নিগ্ধতার অবসাদটুকু মাখাইয়া দিয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল, নিসর্গ-কবিতা কবির অনুরাগটিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নিজেকে হয় চিত্রধর্ম্মী, না হয় সঙ্গীতধর্ম্মী, না হয় ভাবধর্ম্মী করিয়া তোলে।

কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন এই তিনটি ধর্ম্ম অর্থাৎ চিত্রধর্ম্ম, সঙ্গীতধর্ম্ম এবং ভাবধর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে এক একটি কবিতাকে আশ্রয়

করিয়া ফুটিয়া উঠে। প্রত্যেক নিসর্গ-কবিতার অথবা এক কথায় প্রত্যেক গীতি কবিতার মধ্যে এই তিনটি ধর্ম্মেরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোথাও বা চিত্রধর্ম্মের প্রাধান্য বেশি, কোথাও বা সঙ্গীতধর্ম্মের প্রাধান্য বেশি, আবার কোথাও বা ভাবধর্ম্মের প্রাধান্য বেশি। এই তিনটি ধর্ম্মের সহিত আলাদা আলাদা করিয়া পরিচিত হইবার জন্য ইহাদের উদাহরণ পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া হইল। তাহা না হইলে প্রত্যেক প্রথমশ্রেণীর কবিতাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে এই তিনটি ধর্ম্মই সেখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই তিনটি ধর্ম্মের দুইটিকে একেবারে বাদ দিয়া কেবল একটির সাহায্যে কোন দিন প্রথম শ্রেণীর কবিতা দাঁড়াইতে পারে না। শুধু কেবল সঙ্গীত-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, চিত্রধর্ম্ম এবং ভাবধর্ম্মকে একেবারে বাদ দিয়া যেমন প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচিত হইতে পারে না, তেমনি শুধু কেবল চিত্রধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সঙ্গীতধর্ম্ম এবং ভাবধর্ম্মকে বাদ দিয়াও কোন দিন প্রথম শ্রেণীর কবিতা আশা করা যাইতে পারে না। আবার শুধু কেবল ভাবধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, চিত্রধর্ম্ম এবং সঙ্গীতধর্ম্মকে বাদ দিয়াও কোনদিন প্রথম শ্রেণীর কবিতার সৃষ্টি হইতে পারে না।

শুধু কেবল সঙ্গীতধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া কবিতা যে কত পঙ্গু হইয়া পড়ে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আবার শুধু কেবল চিত্রধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াও কোন কবি প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করিতে পারেন না। এ বিষয়ে কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর নিসর্গ-কবিতাগুলি চমৎকার উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে কবি বিহরীলালের মত প্রকৃতির পানে এমন চোখ-মেলিয়া চাহিতে কোন বাঙ্গালী কবিকেই দেখা যায় নাই। কিন্তু তথাপি তাঁর নিসর্গ-কবিতাগুলি কোনদিনই প্রথম শ্রেণীর গীতি-কবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

তাহার কারণ সেগুলির মধ্যে সঙ্গীতের মাধুর্য্য একেবারেই ছিল না। কবির রচনা হইতে উদাহরণ দিয়া জিনিষটাকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। পর্ব্বতের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বিহারীলাল একস্থলে বলিতেছেন :—

দূর থেকে দেখি গিরি যেন ঠিক মেঘোদয়,
আকাশে মেঘের সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মিশে রয় ;
অগ্রসর হই যত, আকাশ ছাড়িয়ে তত
ক্রমে বসে যায় নিম্নে আকাশ উন্নত হয়,
প্রকাণ্ড স্তূপের প্রায়, লতা পাতা ঢাকা গায়,
উচ্চ নীচ কত মত চূড়া শোভে শিরোময় ;
ওই সে বৃহৎ রাশি স্পষ্ট দেহ পরকাশি,
সুদীর্ঘ প্রাচীর প্রায় হতেছে বিস্তার ;
যারা ছিল লতা পাতা, ক্রমে ক্রমে তোলে মাথা,
স্কন্ধে কাণ্ড প্রকাশিয়ে বৃক্ষে পরিণত হয় ; ইত্যাদি

চিত্রটি কবি হুবহু আঁকিয়াছেন, চমৎকার দেখিবার শক্তি ;—কিন্তু তবু কবিতা জমিল না। ইহার মধ্যে সঙ্গীত একেবারেই নাই। কোন নিসর্গ-দৃশ্য ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্র হইয়া উঠিতে পারে না যতক্ষণ না তাহা সঙ্গীতের সাহায্য লইতেছে। সঙ্গীতবিহীন দৃশ্য চিত্র নয়—ফোটোগ্রাফ। কবিতা ত আর দেখার প্রকাশ নয়, তাহা অনুভূতির প্রকাশ, সুতরাং তাহা দেখার ভাষায় ব্যক্ত করিলে চলিবে কেন ?—তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে অনুভূতির ভাষায়—এবং অনুভূতির ভাষাই সঙ্গীত। তাই দেখার সহিত চাই অনুভূতি ; তাই চিত্রের সহিত চাই সঙ্গীত ; তাই রূপের সহিত চাই ধ্বনি। বিহারীলালের কবিতা যে কোনদিন প্রথম শ্রেণীর কবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও

কেহ কোনদিন যে তাঁহার কাব্য-সৃষ্টিগুলিকে উক্ত শ্রেণীতে বসাইয়া দিতে পারিবে না, তাহার একমাত্র কারণ বিহারীলালের কবিতার ভাষা চোখে-দেখার ভাষা—অনুভূতির ভাষা নয় ;—তাঁহার ভাষায় অর্থ আছে, কিন্তু সঙ্গীত নাই। একথা শুধু বিহারীলালের নিসর্গ-কবিতার সম্পর্কেই যে বলিতেছি এমন নয়—তাঁহার সকল শ্রেণীর কবিতার গোড়াতেই এই গলদটি বর্ত্তমান।

আবার দেখা যায়, শুধু কেবল ভাবধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াও কোনদিন প্রথম শ্রেণীর কবিতা গড়িয়া উঠিতে পারে না। তার কারণ চিত্রবর্জ্জিত এবং সঙ্গীতবর্জ্জিত ভাব তত্ত্ব মাত্র। তাই এই শ্রেণীর কবিতাও যাহা আর তত্ত্বকে শ্লোকে রচনা করাও তাহাই। তাহা হইলে দেখা গেল কোনও নিসর্গ-বর্ণনাকে কবিতায় পরিণত করিতে হইলে চিত্র, সঙ্গীত ও ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃতির হুবহু বর্ণনা করিয়া কেহ নিসর্গ-কবিতার সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার সহিত চাই কবির রসানুভূতি, কবির অন্তরের অনুরাগ, কবির 'আপন মনের মাধুরী'স্পর্শ। ভাবধর্ম্মী নিসর্গ-বর্ণনার মধ্যে কবি 'আপন মনের মাধুরী' যে অনায়াসে মিশাইতে পারেন—এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় থাকিতে পারে না, কেন না ভাবধর্ম্মী নিসর্গ-বর্ণনার মধ্যে কবির নিজের মনের রূপই ফুটিয়া উঠে। সঙ্গীতধর্ম্মী নিসর্গ-বর্ণনার মধ্যেও কবি 'আপন মনের মাধুরী' অনায়াসে মিশাইতে পারেন, কেন না সুর জিনিষটা স্বভাবতই আমাদের ভিতর হইতে আসে। কিন্তু চিত্রধর্ম্মী নিসর্গ-বর্ণনার মধ্যে কবির 'আপন মনের মাধুরী' মিশিবে কিরূপে ? সেখানে প্রকৃতির নিজস্ব বাহিরের রূপই তো কবি আঁকিতে-ছেন,—নিজের মনের কথা ত কিছুই বলিতেছেন না। যেমন সন্ধ্যার রূপটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কবি যখন বলিতেছেন—

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়াছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না ; শূন্য মাঠ জনহীন ;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়।

ইহার মধ্যে কবির 'আপন মনের মাধুরী' খুঁজিয়া পাইব কিরূপে? এই বর্ণনাটুকুর মধ্যে কেবল গোটাকতক প্রাকৃতিক দৃশ্য পাশাপাশি সাজান হইয়াছে। ইহার মধ্যে কবি 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইলেন কোনখানটায়?—কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

মানুষ যখন একটি বিশেষ মেজাজ বা moodএর ভিতর দিয়া প্রকৃতির পানে তাকায়, তখন প্রকৃতির সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার তাহার চোখে পড়ে না,—তখন মাত্র সেই সকল দৃশ্য চোখে পড়িয়া যায় যেগুলি সেই বিশেষ মেজাজটির অনুকূল।

প্রকৃতির মধ্যে নানা দৃশ্য ছড়াইয়া রহিয়াছে। যখন কোন বিশেষ একটি mood বা মেজাজের ভিতর দিয়া আমরা প্রকৃতির পানে চাই না, তখন এই সকল অসংখ্য বিচ্ছিন্ন দৃশ্য নির্বিচারে ভিড় করিয়া আমাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু বিশেষ একটি mood বা মেজাজের ভিতর দিয়া আমরা যখন প্রকৃতির পানে তাকাই, তখন এমন ধারাটা হইতে পারে না। তখন আমাদের নিজের সেই সময়কার mood বা মেজাজ যে সকল দৃশ্যকে নিজের সমধর্ম্মী বলিয়া মনে করে, কেবল সেইগুলিকেই মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে অধিকার দেয়।

সন্ধ্যার অলস নীরবতা যখন কবির মনের মধ্যে একটি mood সৃষ্টি করিল, তখন কবির মন সন্ধ্যাপ্রকৃতির সকল খণ্ড দৃশ্যগুলিই গ্রহণ

করিল না,—মাত্র সেইগুলিকেই গ্রহণ করিল, তাঁহার সেই অবসাদের moodটিকে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে যেগুলি সম্পূর্ণ উপযোগী।

তাই চিত্রধর্ম্মী নিসর্গ-বর্ণনার মধ্যে কবি তাঁহার 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইতে পারিয়াছেন কিনা তাহা বাহির হইতে ধরা পড়িয়া যায় তাঁর দৃশ্যসমাবেশের রুচির ভিতর দিয়া। আমরা যদি দেখি কবির বর্ণিত দৃশ্যগুলি পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পাশাপাশি বর্ত্তমান রহিয়াছে,—তাহাদের সমাবেশে কোন একটি ঐক্যতান বাজিয়া উঠিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে কবি কোন বিশেষ অনুরঞ্জিত দৃষ্টি দিয়া প্রকৃতির পানে তাকান নাই, তাকাইয়াছেন একেবারে সাদা চোখে। যেমন শরতের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কবি হেমচন্দ্র লিখিতেছেন—

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ঝরিল।
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল॥
হরিৎশস্যের কোলে দেখরে মঞ্জরী দোলে
ভানু ছটা তাহে কিবা শোভা দিয়া পড়েছে।
বহিলে মৃদুল বায় ঢলিয়া ঢলিয়া তায়
তটিনী তরঙ্গ লীলা অবনীতে খেলিছে।
গোঠে গাভী বৃষসনে চরিছে আনন্দ মনে,
হরষিত তরুলতা ফলে ফুলে সেজেছে।
সরোবরে সরোরুহ কুমুদ কহ্লার সহ
শরতে সুন্দর হয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।

ইহার মধ্যে শরতের প্রকৃতির গোটাকতক দৃশ্য পাশাপাশি সাজান হইয়াছে মাত্র। ইহার মধ্যে কবির কোন moodএর পরিচয় পাই না। কবি যদি কোন বিশেষ mood লইয়া শরতের প্রকৃতির পানে তাকাইতেন,

তাহা হইলে কবিতার অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন খণ্ড দৃশ্যগুলি একটি অখণ্ড সুরে বাজিয়া উঠিত অর্থাৎ কবি এখানে শরতকে একেবারে সাদা চোখে দেখিয়াছেন ;- সাধারণ লোকে যে চোখে দেখে সেই চোখেই।

রসের জগতে শরৎ ঋতু ত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দৃশ্যের সমষ্টিমাত্র নয়। তাহার মধ্যে একটি আত্মা আছে, একটি চরিত্র আছে। মানুষের চরিত্র, মানুষের ব্যক্তিত্ব যেমন জীবনের কয়টি ঘটনা বা অবস্থাকে পাশাপাশি সাজাইয়া নিরূপণ করা যায় না, শরতের আত্মাটিও তেমনি তাহার কয়েকটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের সমাবেশের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে না। মানুষের স্বভাব বা ব্যক্তিত্ব যেমন তার জীবনের সকল কাজের, সকল ঘটনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে না, জীবনের বিশেষ একটি ক্ষণে, বিশেষ একটি মুহূর্ত্তে, বিশেষ একটি ঘটনার ভিতর দিয়াই আপনাকে নিমেষে ধরা দিয়া ফেলে, ঠিক তেমনি করিয়া শরতের স্বরূপ, শরতের আত্মা তাহার সকল দৃশ্যের, সকল ঘটনার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে না,—একটি বিশেষ ক্ষণে, বিশেষ মুহূর্ত্তে, বিশেষ কয়েকটি অবস্থার ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলে। কবির রসদৃষ্টি এই ক্ষণটিকে, এই নিমেষটিকে, এই বিশেষ অবস্থাটিকে ধরিয়া ফেলে। তাই দরদী কবির শরৎবর্ণনার ভিতরে শরতের আত্মাটি,—স্বরূপটি আপনা হইতে ধরা পড়িয়া যায়

আমার মনে হয় এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আমাদের বাংলা-সাহিত্যে নিসর্গ-বর্ণনার কবিতা একেবারেই ছিল না। সম্ভবতঃ ইহা ইংরেজী সাহিত্যের দান।

আমাদের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত পক্ষে নিসর্গ কবিতা কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কাব্যের মধ্যে বিরহিণী নায়িকার বারমাসের দুঃখবর্ণনা প্রসঙ্গে ষড়্ঋতুর একটু আধটু পরিচয় পাওয়া যায়

বটে—তাহাও কিন্তু নায়িকার সুখ দুঃখের নিয়ামকরূপে। তাছাড়াও যে দুই এক স্থলে প্রকৃতির বর্ণনা না পাওয়া যায় এমন নয়, কিন্তু তাহা নায়ক নায়িকার সুখদুঃখের পটভূমিকা (background) হিসাবে। প্রকৃতিকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে ধরিয়া কবিতা রচনার প্রথা বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে নাই বলিলেই চলে। মানুষের সুবিধা অসুবিধার নিয়ন্তৃরূপে অথবা প্রেমিকপ্রেমিকার বাসরসভার শোভাবৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে প্রকৃতিকে কবি যখন দেখেন তখন প্রকৃতি তাহার নিজস্ব স্বাধীন সত্তা হারাইয়া ফেলিয়া প্রাণহীন হইয়া পড়ে। অথচ প্রকৃত নিসর্গ-কবিতার মধ্যে প্রকৃতি একটি জীবন্ত স্বাধীন সত্তা,—তাহার নিজের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ।

আমার মনে হয় প্রকৃতিকে বিষয়বস্তু স্বরূপ গ্রহণ করিয়া কবিতা লেখার প্রথা আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সে কিন্তু নামে মাত্র। প্রকৃতিকে বিষয়বস্তুরূপে ধরিয়া কবিতা লিখিলেও তাহার মধ্যে প্রকৃতির প্রতি গুপ্ত-কবির কোনও মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃতির বিশেষ একটি রূপ আঁকিতে বসিয়া গুপ্ত কবি কেবল সেই লক্ষণগুলির উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন যেগুলি তাহার বাহিরের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। কোন একটি মানুষের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কেহ যদি বলেন, তাহার দুইটি হাত আছে, দুইটি পা আছে, এক জোড়া চক্ষু আছে ইত্যাদি, তাহা হইলে সেই মানুষটির সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হইল না, তেমনি বর্ষা, বসন্ত বা শরত ঋতুর একটিকে বর্ণনা করিতে গিয়া কেহ যদি ইহাদের অতিবড় স্থূল লক্ষণগুলির তালিকা দিয়াই ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে তাহার দ্বারা এই তিনটি ঋতুর সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় না. তাই বর্ষার রূপবর্ণনা করিতে বসিয়া গুপ্ত কবি যখন বলিতেছেন—

চারিদিকে ঘোরতর নীরধর আড়ম্বর
শূন্য'পর করে অতিশয়।
চারু চারু সমুন্নিত গুরু গুরু গরজিত
দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়॥
বহিতেছে সমীরণ করিতেছে ঘোর রণ
নিদাঘ বরষা সহকার।
সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাঝে মাঝে,
শব্দ করে, স্তব্ধ ত্রিসংসার॥
চক মক্ চিকি মিকি ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা॥
একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুলকে চাতক দল পান করে ধারা-জল,
গান করে রসিয়া রসিয়া॥

তখন বর্ষার হাত, পা, চোখ নাকের উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই পাই না। বর্ষাকালে শন্ শন্ করিয়া বায়ু বয়, বা ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায় একথা বলাও যা আর মানুষে কথা কয়, বা পায়ে হাঁটিয়া চলে একথা বলাও তাই। এইরূপ বর্ণনার দ্বারা আমরা বর্ণিত বিষয়ের কোন বিশিষ্ট রূপ যেমন পাইনা, তেমনি বর্ণিত বিষয়ের সহিত কবির মানসিক কোন সম্পর্কও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি না।

মানুষ হাঁটিয়া চলিয়াছে—ইহা দেখা নয়—ইহা সংস্কার। কিন্তু

একটি মানুষ বিশেষ একটি ভঙ্গীতে হাঁটিতেছে—ইহা চোখ দিয়া দেখিয়া বলা। তাই কবি গোবিন্দদাস যখন বসন্ত বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন :—

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥

তখন বসন্ত ঋতুকে কবি নিজের চোখ দিয়া দেখেন নাই, সংস্কারের চোখ দিয়া দেখিয়াছেন। সংস্কারের চোখ দিয়া দেখিয়া কেহ কোনদিন নিসর্গ-কবিতা রচনা করিতে পারেন না। নিজের চোখ দিয়া যখন আমরা কোন জিনিষ দেখি, তখন তাহার মধ্যে আমরা নিজেকে অনেকখানি দিয়া ফেলি। তাই নিজের দেখা জিনিষের মধ্যে আমাদের স্ব স্ব মনোবৃত্তি অনেকখানি কাজ করে। রচনা-কালের এই মনোবৃত্তিটিকেই আমরা কবির mood বা মেজাজ বলিয়া থাকি। এই বিশেষ moodটিকে বাদ দিয়া কোন দিন প্রথমশ্রেণীর কবিতা রচিত হইতে পারে না।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন আমি চিত্রধর্ম্মী নিসর্গ-কবিতার কথা বলিতেছি। সঙ্গীতধর্ম্মী বা ভাবধর্ম্মী নিসর্গ-বর্ণনা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে খুব বেশী না থাকিলেও মন্দ নাই; কিন্তু চিত্রধর্ম্মী নিসর্গ-বর্ণনা একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে স্বাধীনভাবে আলাদা করিয়া প্রকৃতিকে লইয়া কবিতা রচনার পদ্ধতি আরম্ভ হইয়াছে, বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কিছু পূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি এখনও তাহাই বলি

যে, গুপ্ত কবি প্রকৃতিকে বিষয়বস্তু স্বরূপ ধরিয়া কবিতা রচনা করিলেও তাহার মধ্যে নিসর্গ-কবিতার লক্ষণগুলি একেবারেই পাওয়া যায় না। চিত্রধর্ম্মী নিসর্গ-বর্ণনার মধ্যে কবির নিজের চোখে দেখার পরিচয়টি ফুটিয়া উঠে। গাছের পাতা সবুজ বা আকাশের রং নীল, একথা চোখে না দেখিয়াও বলা যায়। কিন্তু চোখ মেলিয়া যখন প্রকৃতির পানে চাহি, তখন দেখি গাছের পাতা শুধু সবুজ নয়, তাহার মধ্যে বিচিত্র রংএর সমাবেশ হইয়াছে। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখি তাহাতে অসংখ্য রং আসিয়া মিশিয়াছে। আসল কথা, প্রকৃতির পানে আমরা যখন চোখ মেলিয়া তাকাই তখন দেখি প্রকৃতি গোটাকতক কাটাছাঁটা গোণাগুন্তি রূপের সমষ্টিমাত্র নয়, তাহার মধ্যে অসংখ্য বর্ণ, অসংখ্য রূপ সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করিতেছে। এই চোখে প্রকৃতির পানে তাকাইলে প্রকৃতি আমাদের নিকট অপূর্ব্ব হইয়া দেখা দেয়—তাহার মধ্যে আমরা অনন্ত রহস্যের আভাস খুঁজিয়া পাই। এই যে প্রকৃতির পানে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকা ইহার পরিচয় আমরা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে একেবারেই পাই না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম প্রকৃতিকে লইয়া আলাদা করিয়া কবিতা রচনার পথ দেখান। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবেই হউক আর যে কারণেই হউক তিনি এইটুকুমাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, প্রকৃতিকে বিষয়বস্তু স্বরূপ ধরিয়া কবিতা রচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু একথাটি তিনি বুদ্ধির সাহায্যে সম্পূর্ণ বাহির হইতে বুঝিয়াছিলেন—অন্তর দিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই। তাই প্রকৃতিকে বিষয়বস্তুরূপে ধরিয়া কবিতা রচনা করিলেও তিনি প্রকৃত নিসর্গ-কবিতা সৃজন করিতে পারিলেন না।

মাইকেলের মধ্যে নিসর্গ-বর্ণনার লক্ষণ একেবারেই পাওয়া যায় না।

সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে সীতা ও সরমার কথোপকথনের মারফত প্রকৃতির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয় এবং এইখানেই প্রকৃতির সহিত কাব্যের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু সীতা ও সরমার কথোপ-কথনের মধ্যেও আমরা যে প্রকৃতিকে পাই তাহা স্বাধীন প্রকৃতি নয়। সীতার বনবাস-জীবনের সুখের দিনগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে প্রকৃতির যে যে রূপেব উল্লেখ প্রয়োজন হইয়াছে, কবি সেইগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। এ যেন একটি সযত্ন-বিন্যস্ত কৃত্রিম ফুলের তোড়া, যাহার মধ্যে সবই আছে—নাই কেবল সেই সুরভি-প্রাণটুকু। এই বর্ণনার মধ্যে হরিণ, হরিণী আছে, সরোবর আছে, বনদেবী আছে, ময়ূর আছে, কোকিল আছে, সবই আছে—নাই কেবল প্রকৃতি নিজে।

কবি বিহারীলালের কবিতার মধ্যে আমরা প্রথম প্রকৃতির পানে চোখ-মেলিয়া চাওয়ার পরিচয় পাই—সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কবি বিহারীলাল ইংরাজী কবিতা পড়িয়াই হউক বা অন্য কোন উপায়ে হউক এ কথাটা বুঝিয়াছিলেন যে, নিজের চোখে না দেখিয়া নিসর্গ বর্ণনা করিলে তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে, তাহার মধ্যে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিহারীলাল কিন্তু একথাটা জানিতেন না যে শুধু চিত্র কোন দিন কবিতা হইয়া উঠিতে পারে না, তাহার সহিত চাই সঙ্গীত। এই সঙ্গীত বলিয়া জিনিষটি বিহারীলালের মধ্যে আদৌ ছিল না। আসল কথা বিহারীলাল একেবারে সাদা-চোখে প্রকৃতির পানে তাকাইয়াছেন—কোন mood লইয়া নয়। সেই জন্য তাঁহার চোখে-দেখা রূপগুলি বিচ্ছিন্নই থাকিয়া গিয়াছে,—কোন দিন দানা বাঁধিতে পারে নাই। তিনি প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য শুধু চক্ষু নয়, অনেকগুলি ইন্দ্রিয়ই খুলিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু কোন পথ দিয়াই প্রকৃতি তাঁর অনুভূতির রাজ্যে গিয়া পৌছিতে পারে নাই।

তাই 'সমুদ্র দর্শন' নামক কবিতাটির মধ্যে কবি যখন বলিতেছেন—

আগু পাছু কোটি কোটি কি কল্লোল মালা!
প্রকাণ্ড পর্ব্বত সব যেন ছুটে আসে;
উঃ কি প্রচণ্ড রব! কানে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে।

তখন আমরা কবির চোখের এবং কাণের যতটা পরিচয় পাইলাম—সমুদ্রের পরিচয় তার শতাংশের একাংশও পাইলাম না।

আজকাল বিহারীলালকে লইয়া অনেক কিছু লেখা হইতেছে। কেহ কেহ নাকি এমনও বলিতে চান যে, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলির আভাস বিহারীলালের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ যে সকল সূক্ষ্ম ভাবকে লইয়া কবিতা রচনা করিতে গিয়া অত্যন্ত জটিল এবং অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, বিহারীলাল সেইগুলিকে নাকি অত্যন্ত সহজ করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এ কথাটা একদিক হইতে খুবই সত্য বিহারীলাল যাহা কিছু লিখিয়াছেন সবই চোখ কাণ দিয়া দেখিয়া শুনিয়া লিখিয়াছেন মাত্র, তাহার সহিত মনের বা অনুভূতির কোন যোগ রাখিতে পারেন নাই। মাত্র চোখ কাণ দিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাহা লেখা হয়, পাঠক তাহা চোখ কাণ দিয়াই অনায়াসে উপভোগ করিতে পারে এবং সাধারণ পাঠকদের চোখ কাণই সম্বল। কিন্তু চোখ কাণের সহিত যখন অনুভূতি আসিয়া মিলে, তখন অনুভূতি জিনিষটি যাহাদের নাই তাহারা ত বলিবেই—কবিতা জটিল হইয়া উঠিল। চোখ কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিতো আর মনের মত জটিল জিনিষ নয়,—তাই চোখ কাণের বিষয়বস্তু চিরদিনই সহজ সরল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমার মধ্যে অনুভূতি নাই, সঙ্গীত নাই, ব্যঞ্জনা নাই, কিছুই নাই, সুতরাং আমি অত্যন্ত সহজ সরল—ইহা কি খুব বাহাদুরীর কথা? যাক, অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিয়া নিজেদের বক্তব্য বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাক্।

আসলকথা বিহারীলাল প্রকৃতির পানে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিলেন বটে কিন্তু চোখে দেখা রূপের সহিত তিনি কোনদিন 'আপন মনের মাধুরীটি মিশাইতে পারেন নাই, অর্থাৎ চিত্রের সহিত তিনি কোনদিন সঙ্গীত যোজনা করিতে পারেন নাই। তবে বিহারীলালের কৃতিত্ব এই যে, তিনি এতদিনকার সংস্কার ভাঙ্গিতে পারিয়াছেন। ইহা বড় কম শক্তি নয়। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম থাকিবে। কিন্তু কবি হিসাবে, স্রষ্টা হিসাবে তাঁহার স্থান যে খুব উচ্চে হইবে সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিহারীলাল ভাঙ্গিয়াছেন অনেক কিছু, কিন্তু গড়িয়া যাইতে পারেন নাই খুব বেশি. সংস্কারক হিসাবে তিনি হয়ত অনেককাল বাঁচিয়া থাকিবেন, কিন্তু স্রষ্টা হিসাবে তাঁহার আসন যে কোথায় পাতা হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

কবি হেমচন্দ্রের মধ্যে আমরা প্রকৃত নিসর্গ-বর্ণনা পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, কেন না গীতিকবিতালেখক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট নাম আছে। কবি হেমচন্দ্র কিন্তু আমাদের সে আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

হেমচন্দ্র ইংরাজী কাব্যসাহিত্য পড়িয়া এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, প্রকৃতির সহিত আপন মনের ভাব মিশাইতে না পারিলে তাহা নিসর্গ-কবিতা হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কবি এ সত্যটি বাহির হইতে বুঝিয়াছিলেন মাত্র, অন্তর দিয়া ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন

নাই। তাই প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে তিনি আপনার মনের ভাব মিশাইতে গিয়াও মিশাইতে পারিলেন না,—তিনি আপনার মনের ভাবগুলি তাহার সহিত বাহির হইতে জুড়িয়া দিলেন মাত্র।

নিসর্গবর্ণনার মধ্যে কবির আপন মনের ভাব থাকা চাই এই কথাটাকে হেমচন্দ্র অত্যন্ত স্থূলভাবে বুঝিয়াছিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন, নিসর্গবর্ণনা করিতে গেলে তাহার সহিত নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ বা অদৃষ্টের কথা বুঝি আলাদা করিয়া জুড়িয়া দিতে হয়; তাই অশোকতরুর কথা বলিতে বলিতে অতি-সচেতন কবি তাহার সহিত শেষ দিকে নিজের কথা জুড়িয়া দিলেন—

তরুরে আমার মন তাপদগ্ধ অনুক্ষণ
কেহ নাই শোকানলে ঢালে অশ্রুধারা
আমি তরু জগতের সুখদুখ হারা।

তাই কোকিলের কুহুস্বর শুনিয়া কবি হেমচন্দ্র তাহার সহিত নিজের দুঃখটি জুড়িয়া দিয়া লিখিলেন—

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন
প্রাবৃটের কাল ঘন করে প্রিয়দরশন
করে চারু গুল্ম, তরু, গহ্বর কানন।
তেমনি হাসিতে ফুল্ল কর বঙ্গ জন!

তাই পদ্মের একটি মৃণালকে সরোবরে ভাসিতে দেখিয়া কবির মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহার সহিত তিনি নিজের চিন্তা জুড়িয়া দিলেন—

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি।
অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি ?

ইহা প্রকৃতিকে নিজের মনের ভাব দিয়া দেখা নয়, ইহা নিজের মনের উক্তিগুলিকে প্রকৃতির কয়েকটি ঘটনার উদাহরণের সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা মাত্র।

বিহারীলাল এবং নবীনচন্দ্রের মধ্যেও এই ধারা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিহারীলালের সহিত হেমচন্দ্রের মিল আছে। কিন্তু আসল যায়গায় বিহারীলালের সহিত হেমচন্দ্রের আকাশপাতাল গরমিল। কবি হেমচন্দ্র প্রাচীন সংস্কারের চোখ দিয়া প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন, আর কবি বিহারীলাল নিজের চোখ দিয়া প্রকৃতির পানে চাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন. তাঁহার সে চাওয়া যে সার্থক হয় নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং কেন যে সার্থক হয় নাই তাহার কারণও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে সার্থক না হইলেও এই চেষ্টার নিজস্ব একটা মূল্য আছে।

নবীনচন্দ্রের মধ্যেও হেমচন্দ্রের এই নিজের মনের ভাব বাহির হইতে জুড়িয়া দিবার অভ্যাসটি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কবি নবীনচন্দ্র সন্ধ্যাকালে

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন
ডুবাতে দিবসশ্রম বিস্মৃতি-সলিলে

এক গিরিশিখরে গিয়া উঠিয়া প্রকৃতির যে শোভা দেখিলেন তাহা একেবারেই গতানুগতিক,—তিনি দেখিলেন,

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি-সুন্দরী
ললাটে সিন্দূরবিন্দু পরিল তখন।
রবি অস্তমিত-প্রায় সুবর্ণে মণ্ডিত কায়
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনী।

ইহা চোখে-দেখা সন্ধ্যা নয়—ইহা সংস্কারের রঙীন চশমার ভিতর দিয়া দেখা সন্ধ্যা। ইহার মধ্যে কবির নিজের মনের কোন দাগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার জন্য কবি আদৌ দুঃখিত নন্;, তাঁহার আশা আছে, শেষের দিকে হঠাৎ নিজের মনের অনেক কিছু কথা বাহির হইতে জুড়িয়া দিয়া এই অভাবটি পূরণ করিয়া লইবেন। এই আশায় তিনি এক রাখাল-শিশুকে তাঁহার কবিতার মধ্যে আনিয়া হাজির করিলেন, তাহার পর তাহাকে উপলক্ষ করিয়া নিজের সারা জীবনের যত কিছু চিন্তা, যত কিছু অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখের কথা উল্লেখ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন'।

এই রাখাল-শিশুটিকে দেখিয়া কবির মনের মধ্যে কত কথাই জাগিয়া উঠিল,—নিজের বাল্যজীবনের কথা, জন্মভূমির পরাধীনতার কথা, এমনি আরো কত কি। ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—

আমিও ইহারি মত ছিলাম সুন্দর
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে—

তার পর কবির মনে পড়িয়া গেল—আহা এই অবোধ শিশুটি—

নাহি জানে নিজেদের অবস্থা কেমন,
নহে ভারতের ভাগ্যে বিষণ্ণ অন্তর।

এমনি আরও কত কি অবান্তর চিন্তা।

নবীনচন্দ্রের মধ্যে কিন্তু মধ্যে মধ্যে সত্যকারের নিসর্গবর্ণনার আভাস পাওয়া যায়।

তাঁর—

মরালের কলরব বিহঙ্গকূজন,
তরুতলে শূন্যমনে রাখালের গীত,
বালকের ক্রীড়াধ্বনি শৈশব-সঙ্গীত,
গ্রামবাসি কোলাহল, সাগর-গর্জ্জন
দূরবহ সন্ধ্যানিলে মধুর হইয়া
বিমোহিত করিতেছে শ্রবণ বিবর।

অথবা তাঁহার মধ্যাহ্ন বর্ণনায় যেখানে তিনি বলিতেছেন—

কেবল বায়সগণ মুদিয়া নয়ন
কাতরে ডাকিতেছিল তৃষ্ণাভগ্ন স্বরে ;
গাভীগণ তরুতলে মুদিয়া নয়ন
রোমন্থ করিতেছিল ক্লান্ত কলেবরে।

কবি সেখানে গোটাকতক বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যকে পাশাপাশি জুড়িয়া দেন নাই মাত্র,—এই দৃশ্য-সমাবেশের মধ্যে তাঁহার নির্ব্বাচিনরুচির যথেষ্ট

পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা, কবি নবীনচন্দ্রের মধ্যে সেই জিনিষটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছিল, যাহা চোখে দেখা বিচ্ছিন্ন খণ্ডদৃশ্যগুলিকে একটি সমন্বয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে পারে। অর্থাৎ এক কথায় তাঁহার মধ্যে ছিল সঙ্গীত।

নিজের চোখ দিয়া প্রকৃতির পানে যিনি না তাকাইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা প্রথম শ্রেণীর নিসর্গবর্ণনা কোনক্রমেই রচিত হইতে পারে না একথা খুব সত্য, কিন্তু একথা সত্য নয় যে নিজের চোখে দেখিয়া আমরা যাহা কিছু লিখিব তাহাই নিসর্গ-কবিতা হইয়া উঠিবে। আসল কথা, আমরা যখন সাদা চোখে প্রকৃতির পানে তাকাই তখন তাহা রসবস্তু হইয়া উঠে না,—জড়বস্তুই থাকিয়া যায়। কিন্তু আমরা যখন মনের বিশেষ একটি রসঘন অবস্থায় প্রকৃতির পানে তাকাই তখন প্রকৃতির সেই চোখে-দেখা রূপ একটি অপূর্ব্বতা লাভ করে—তখনই তাহা রসবস্তু হইয়া উঠে।

কবি বিহারীলাল প্রকৃতির পানে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিলেন একথা সত্য, কিন্তু মনের সে রসঘন অবস্থাটি তাঁর ছিল না যাহা তাঁর চোখে দেখা রূপগুলিকে একটি অপূর্ব্বতা দান করিতে পারে। আসল কথা তাঁহার মধ্যে 'চিত্র' ছিল কিছু কিছু—কিন্তু 'সঙ্গীত' ছিল না একেবারেই নবীন-চন্দ্রের মধ্যে দুই এক স্থলে চিত্র এবং সঙ্গীতের একত্র সমাবেশ ঘটিতে দেখা গিয়াছে। কিছু পূর্ব্বেই তাহার দু-একটি উদাহরণ দিয়াছি। কিন্তু নবীনচন্দ্রের মধ্যে এই শ্রেণীর রচনা খুব কমই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথে আসিয়া নিসর্গ কবিতা নূতন রূপ পাইল। রবীন্দ্রনাথের নিসর্গবর্ণনা অপূর্ব্ব।

তাঁর—

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত ; সুন্দর বাতাস

মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়; ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে, ভাঙ্গা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়া পূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্রশীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্য-ক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত

অথবা তার—

বেলা দ্বিপ্রহর
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরী'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝটপটি। শ্যাম শষ্প তটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।

চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহংস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে যায় ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহু দূরে॥

চিত্রধর্মী নিসর্গ-কবিতা হিসাবে ইহারা অতুলনীয়। ইহারা নিজেরাই কথা বলে; অন্য কিছু বক্তব্য ইহাদের সহিত জুড়িয়া দিতে হয় না। চিত্রকলার মত চিত্রধর্মী নিসর্গ-কবিতার ভাষা তাহার রঙ এবং রেখা!

একটা কথা কিন্তু এই সঙ্গে লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-কবিতার যে কয়টি টুক্‌রা এ পর্য্যন্ত আমরা উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম, একটু নজর করিলেই দেখা যায় তাহার সব কয়টিই শান্তরসের রচনা; শুধু প্রকৃতিবর্ণনায় নয়—সকল দিক হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা এই শান্তরসের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ শান্তরসের উপাসক। সুতরাং তাঁহার নিসর্গ-কবিতায় তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু যে তাঁহাকে রুদ্র বা অন্যান্য পৌরুষ-ব্যঞ্জক রস ফুটাইতে বাধা দিয়াছে তাহা নয়,—বাধা দিয়াছে তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক গঠন,—তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি।

তিনি সমুদ্র সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। বিষয়বস্তু হিসাবে ইহারা অনায়াসে পৌরুষব্যঞ্জক হইয়া উঠিতে পারিত; কিন্তু তাঁহার মনের স্বাভাবিক গঠন,—তাঁহার শান্তরসপূর্ণ হৃদয়ের স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা

তাহা হইতে দেয় নাই। সমুদ্রের ধ্বংস-মূর্ত্তি তিনি দেখেন নাই ;—তাই বলিয়া সমুদ্রের বিরাটত্ব তাঁহার রসদৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

সমুদ্রের মত পদ্মার তীরে দাঁড়াইয়াও কবি তাহার প্রশান্ত উদারতাই উপভোগ করিলেন : তাহার ধ্বংসমূর্ত্তি কবির চোখে একবারও পড়িল না। পদ্মার বৎসলা মূর্ত্তিই তিনি দেখিলেন। সে যেন একটি বিরাট নিদ্রিতা মাতা ; তাহার সমস্ত বুকের উপর অসংখ্য সন্তান সন্ততি কত উপদ্রবই না করিতেছে—

বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নত শির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া ; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বর
কলহাস্যে ; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ জ্বালাতন

অনেকে হয় ত বলিবেন কবির সমুদ্রবর্ণনার মধ্যে সমুদ্রের ধ্বংসের রূপ যে কোথাও ফোটে নাই তাহা কি করিয়া বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁহারা কবির "কথা ও কাহিনীর" "দেবতার গ্রাস" নামক কবিতার উল্লেখ করিতে পারেন। সেখানে পুণ্যলোভাতুর মিত্রমহাশয় সাগর-স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিবার পথে সমুদ্রের যে ধ্বংসমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা রীতিমত ভয়ঙ্কর এবং প্রচণ্ড।

চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। একদিকে যায় দেখা
অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা ;—

অন্যদিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যের পানে উঠিছে উচ্ছাসি
উদ্ধত বিদ্রোহভরে

মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহ-জিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।

কিন্তু সমুদ্রের এই যে ধ্বংসমূর্ত্তি, ইহাত কবি দেখেন নাই—দেখিয়াছেন মিত্রমহাশয় এবং সবচেয়ে বেশি দেখিয়াছে সেই বিধবা রমণীটি, যাহার একমাত্র পুত্রটিকে এই নিষ্ঠুর সমুদ্র-দেবতার চরণে বলি দিতে হইয়াছে। এখানে কবি যে নাট্যকার। একজন কবি কোন্ রসের সাধক তাহা জানিতে হইলে তাঁহার গীতি-কবিতার আশ্রয় লওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ। নাটক নভেলের ভিতর দিয়া যে কবির রসবৃত্তি ধরা পড়ে না তাহা নয়, সে কিন্তু সব জড়াইয়া। আলাদা করিয়া খানিকটা অংশ দেখিলেই মুস্কিলে পড়িতে হইবে। লা-মিজারেবলের মধ্যে যুদ্ধবর্ণনা যতই কেন ভীষণ এবং প্রচণ্ড হউক না ভিক্তরহুগো যে শান্তরসের সাধক তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনীর' অনেক কবিতার মধ্যে নিষ্ঠুরতা যথেষ্ট ফুটিয়াছে, তাহার কারণ কবি সেখানে নাট্যকার ; কবি সেখানে দ্রষ্টা, স্বয়ং ভোক্তা নন। গীতিকবিতার মধ্যে কিন্তু কবি নিজেই ভোক্তা, তাই সেখানে কবির নিজের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে কঠোরতা বা নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাহা নয়—পারেন, কিন্তু নিজের অনুভূতির সাহায্যে নয়—অপর কোন চরিত্রের মধ্যে কল্পনায় আপনাকে লইয়া গিয়া।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-কবিতা শান্ত-রসপ্রধান। যে শান্ত-রস স্রষ্টার চরণ-ধূলার তলে তাঁহার মাথা নত করাইয়া দিয়াছে, সেই একই শান্তরস প্রকৃতির শান্ত উদার মহিমার পাদপীঠের সম্মুখে তাঁহার জীবনের সমস্ত চাঞ্চল্য, সমস্ত কোলাহল থামাইয়া দিয়াছে। যে শান্তরসে অণুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎ কবিতার মধ্যে তিনি বলিয়াছেন—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

—সেই একই শান্তরসে আবিষ্ট হইয়া কবি প্রকৃতির নিকট নিবেদন করিয়াছেন—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল তলে।

ভগবানের মত প্রকৃতির নিকটও কবি মাথা নত করিয়া ধন্য হইতে চান। এখানেও সেই মাথা নত করিয়া দিবার, সেই আপনাকে ভুলিয়া প্রকৃতির বিরাটতর সত্তার মধ্যে আমিত্বকে হারাইয়া ফেলিবার আকুল প্রার্থনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ঋতুর দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা বর্ষা এবং শরতের কবিতাই অধিক পাই। বর্ষার মধ্যে প্রচণ্ডতা এবং উদ্দামতা যথেষ্ট আছে। তার ঝঞ্ঝার মধ্যে, তার বজ্রের মধ্যে যথেষ্ট পৌরুষ, যথেষ্ট উগ্রতা রহিয়াছে। কিন্তু কবির শান্তরসপ্রধান চিত্ত বর্ষার এই রুদ্ররূপ কোনদিন অনুভব করে নাই—মনেব গঠনও সেরূপ তাঁহার নয়

শরতের দিক দিয়াও ঐ একই কথা বলা যায়। শরতের উৎফুল্লতার দিক, উৎসবের দিকই সাধারণতঃ আমাদের নজরে পড়িয়া যায়, কিন্তু শান্তরসপ্রধান কবিচিত্তে শরতের এই দিকটি আদৌ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। উৎফুল্লতা এবং উৎসবের ঘটা শান্তরসের পরিপোষক নয়। ইহারা মানুষের মনকে বিচলিত করিয়া তুলে এবং মনের এই বিচলিত অবস্থা, এই চাঞ্চল্য যে চিত্তের শান্ত-অবস্থাকে নষ্ট করিয়া দেয় তাহাতে সন্দেহ নাই। উৎফুল্লতা এবং উদ্দামতা শান্তরসের পরিপন্থী। শান্ত-রসের দিক হইতে আমরা বরং করুণ বা উদাসসুরের নীচু পর্দ্দায় নামিয়া যাইতে পারি, কিন্তু উৎফুল্লতা বা উদ্দামতার চড়া-পর্দ্দায় উঠিতে পারি না। মানুষের চিত্তবীণার খাদের সপ্তককে আশ্রয় করিয়াই বোধ হয় শান্তরসের যত কিছু সুরের খেলা চলিয়াছে, উহার গতিই তাই ক্রমাগত খাদের দিকে। তাই রবীন্দ্রনাথের শান্তরসপ্রধান চিত্তের মধ্যে আমরা অনেক সময়েই করুণ বা উদাস সুরের আমেজ দেখিতে পাই। তাই বর্ষার কবিতার অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের একটা অস্পষ্ট স্পর্শ আমরা অনেক সময় অনুভব করি। বর্ষার অবসাদময় ক্ষণগুলি তাঁহার মনের মধ্যে হয় বিরহ, না হয় অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। অতীতের স্মৃতির সহিত একটি করুণ সুর স্বভাবতই জড়াইয়া থাকে। যাহাকে ফেলিয়া আসিয়াছি পশ্চাতে ফিরিয়া তাহার জন্য, কেন কে জানে, প্রাণটা আপনা হইতেই ভিতরে ভিতরে ব্যথাতুর হইয়া

উঠে। তাই রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা অনেক স্থলেই অতীতের স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে।

তাই কবির—

মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে।
কত দিনের কত খেলা কত ঘরের কোণে।

তাই—

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে ছেলে বেলা,
নালার জলে ভাসিয়ে ছিলাম
পাতার ভেলা।

তাই বর্ষার দিনে কবি গাহিয়া উঠেন—

ওরে আজি বহু দূরের বহু দিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর ছুটেছে কোন্‌খানে।

শুধু কি অতীতের স্মৃতি,—আরো কত কি সেই সঙ্গে কবির মনে পড়িয়া যায়। সব জড়াইয়া বর্ষা-ঋতু কবির নিকট একটি মূর্ত্তিমান দীর্ঘনিশ্বাসের মত মনে হয়। তাই বর্ষার বর্ণনা করিতে বসিয়া কবিকে বলিতে হয়—

কে যেন রে মুহুর্মুহু নিশ্বাস ফেলিছে হু হু,
হু হু করে কেঁদে কেঁদে ওঠে।

তাই আষাঢ়সন্ধ্যায় কবির প্রাণ নীরবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠে—

দূরের পানে মেলে আঁখি
সদাই আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।

বর্ষা কবির প্রাণে আর একটি জিনিষ জাগাইয়া তুলে—সেটি বিরহ ব্যথা। সেই আদিম বিরহব্যথা, সেই আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের বিরহব্যথা ;—তাই বর্ষার দিনে কবির বড় একা-একা ঠেকে। কবি বড় দুঃখে বলিয়া উঠেন,—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার ক'রে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে

কবি কালিদাসের বিরহী যক্ষও এমন দিনে এমনি করিয়াই কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং,
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ,
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥

হে গুণবতি! যে হিমাদ্রিবায়ু দেবদারুর পত্রপুটসমূহ ভেদ করিয়া তদ্‌গলিত ক্ষীরস্রুতির সুগন্ধ বহনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতেছে, যদি কোন প্রকারে তাহা তোমার দেহসংলগ্ন হইয়া থাকে, এই আশায় আমি বায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া ধরি।

ঠিক এমন দিনেই বিদ্যাপতির রাধা বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

বর্ষার দিনে রবীন্দ্রনাথের নিকট কাজের জগৎ, সংস্কারের জগৎ মেঘের পর্দার আড়ালে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেই দিনে তাঁহার মনে হয়, অনেক কথা তিনি যেন সেদিন বলিতে পারেন, অন্যদিনে যাহা বলিতে তাঁর বাধ-বাধ ঠেকিত। সামাজিক সংস্কার, লজ্জা, সঙ্কোচ, প্রভৃতি যে সকল বাধা অন্যদিনে তাহার মনের কথাটি বলিতে দেয় নাই, মেঘের আড়ালে বিশ্বসংসারটাকে তফাৎ করিয়া দিয়া আজ প্রিয়তমার নিকট সেই কথাটি যেন বলিতে পারা যায়। জগতের অসংখ্য বন্ধন আজ যেন মুক্ত হইয়া গিয়াছে;—সংস্কারের সকল অর্গল আজ যেন খুলিয়া গিয়াছে।

অন্তরে আজ কি কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্গলো আগল।
হৃদয় মাঝে জাগলো পাগল
আজি ভাদরে।
আজ, এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে।

আদিমকালের সেই যে পাগলটী আমাদের মনের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছে, সংস্কার যাহাকে মনের কোন্ এক অন্ধ কুঠরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—পাছে সে সৃষ্টিছাড়া একটা কিছু করিয়া বসে, পাছে সে সংস্কারের ভব্যতার সীমা ছাড়াইয়া যায়, বর্ষা আজ তাহার সেই

বন্দিশালার অর্গলটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আজ তাই কবির অন্তর্লোকের সেই মুক্ত পাগলটী বারবার গাহিয়া উঠিতেছে—

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ শান্ত-রসের সাধক। ঋতুর দিক হইতে তাই তিনি বর্ষাকেই বেশি করিয়া আশ্রয় করিয়াছেন। বর্ষা ছাড়া আর যে ঋতুটিকে তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন, তাহা শরৎ। শরতের পীতরৌদ্রের মধ্যে বেশ একটু উদাসীনতার আমেজ আছে। শরতের উদার প্রশান্ত মাঠের উপর মেঘ ও রৌদ্রের যে স্বপ্নময় উদাসভাবটি ফুটিয়া উঠে কবিকে তাহাই মুগ্ধ করিয়াছে। এখানেও কবি শান্ত এবং করুণ রসেরই পরিচয় দিয়াছেন। সেই একটা অজানা অবসাদ, একটা কি যেন নীরব ব্যথা। তাই কবি বলিতেছেন—

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কী যে চায়।
ওই সেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়।
আজি মধুর বাতাসে পরাণ উদাসে
রহেনা আবাসে মন হায়।

কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুল বাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।

সেই উড়ো-উড়ো ভাব, সেই কাজের জগতের বাহিরে মনকে উধাও করিয়া দিয়া অলসভাবে নীরবে চাহিয়া থাকা। কবির এই উদাসীন ভাবটি তাঁহার অনেক নিসর্গ-কবিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। দ্বিপ্রহরের অলস ক্ষণটিতে কবির মনে হয়—

কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।

শরতের পীতরৌদ্রস্নাত দিগন্তবিস্তৃত উদার শস্যক্ষেত্র এবং তাহারই উপরকার ঐ উদার "স্বচ্ছতম নীলাভ্রের দিগন্ত বিস্তার" কবির এই অলস দিবাস্বপ্ন, এই লক্ষ্যহীন উদাসীনতার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

বৎসরের মধ্যে যেমন বর্ষা এবং শরৎ, দিবসের মধ্যে তেমনি সন্ধ্যা এবং দ্বিপ্রহর কবির নিকট বড়ই প্রিয়। আমার মনে হয়, যে কারণে কবির নিকট বর্ষা এবং শরৎ এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই কারণেই সন্ধ্যা এবং দ্বিপ্রহর তাহাকে এত মুগ্ধ করিয়াছে। রসের দিক হইতে বর্ষাঋতু এবং সন্ধ্যাকাল এক জাতীয়; আর শরৎ এবং দ্বিপ্রহরও এক জাতীয়। বর্ষার অবসাদ এবং কারুণ্যটুকু সন্ধ্যার মধ্যেও পাওয়া যায়, আবার শরতের সমস্ত রূপই তাহার দ্বিপ্রহরের মধ্যেই পরিস্ফুট। তাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবিতা লিখিতে বসিয়া অনেক স্থলেই তাহার

সহিত সন্ধ্যা আনিয়া ফেলিয়াছেন : বর্ষাঋতুর বুকের মধ্যে প্রভাত, দ্বিপ্রহর বা অপরাহ্নের স্থানই নাই বর্ষার দিনে ধরণীর বুকে সকাল হইতেই সন্ধ্যা নামিয়া আসে। আবার দেখা যায়, শরতের কবিতা লিখিতে বসিয়া কবি তাহার সহিত দ্বিপ্রহরকে আনিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন। শরতের রূপটাই কবির নিকট দ্বিপ্রহরের রূপ।

কেহ কেহ হয়ত এইখানে এই বলিয়া আপত্তি তুলিতে পারেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কেবল বর্ষা এবং শরৎ ঋতুরই বর্ণনা করিয়াছেন ইহা সত্য নহে। খর-বৈশাখের রুদ্ররূপও কবির চক্ষু এড়ায় নাই। সেখানে আমরা শরৎ বা বর্ষাকে পাই না এবং সেই সঙ্গে অবসাদ বা করুণ-ভাবের আমেজও তাহার মধ্যে নাই। তিনি তাহার 'বৈশাখ' নামক কবিতার গোড়াতেই "হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ" বলিয়া বৈশাখকে সম্বোধন করিয়াছেন। তাহার পর বৈশাখের যে রূপবর্ণনা তিনি করিয়াছেন তাহাও রুদ্ররসপূর্ণ। কবি বলিতেছেন—রুদ্র বৈশাখ তার কবাল বিষাণে হুঙ্কার দিয়া কাহাদের যেন ডাক দিতেছে। সে ডাক শুনিয়া—

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর।

বৈশাখের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়াও কবি তাহার রুদ্রত্বের পরিচয়ই দিয়াছেন—

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ ;
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।

এখানে কবির শান্তরসের পরিচয় ত পাওয়া যায় না ; কিন্তু এখানেও কথা আছে। কবি যে শান্তরসের সাধক তাহা কবিতাটির শেষ দিকে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। কবি বৈশাখের রুদ্ররূপ দেখিলেন বটে, কিন্তু সে রুদ্ররূপ তিনি বেশিক্ষণ বরদাস্ত করিতে পারিলেন না,—সে ধাত তাঁহার নয়। উগ্রতপস্বী বৈশাখের লেলিহান যজ্ঞাগ্নি-শিখা কবির শান্তরসপ্রধান চিত্তকে ভিতরে ভিতরে পীড়া দিতে লাগিল। কবি দুই হস্তে চক্ষু মুদিয়া বলিয়া উঠিলেন—

হে রুদ্র বৈশাখ ! তোমার ও যজ্ঞানল শান্তিজলে নির্ব্বাপিত করিয়া দাও !

হে বৈরাগী কর শান্তি-পাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক্ নদী পার হয়ে, যাক্ চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী কর শান্তি-পাঠ।
সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
অশ্বত্থ ছায়াতে
সকরুণ তব মন্ত্রসাথে।

শরৎ-মধ্যাহ্নের সেই করুণ উদাস ক্ষণটুকুই কবি বৈশাখের বুকের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া তবে আশ্বস্ত হইলেন। সেই উদাস এবং করুণ সুরের একত্র সমাবেশ কবি চান, বৈশাখের শান্তিপাঠ যেন উদার এবং উদাস হইয়া বায়ুস্তরে মিশিয়া যায়।

হে বৈরাগী কর শান্তি-পাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে।

শুধু উদার এবং উদাস নয়,—তাহা যেন আমাদের কর্ণে করুণ হইয়া বাজিয়া উঠে—

সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে।

সেই বর্ষাসন্ধ্যার করুণ এবং শরৎ-মধ্যাহ্নের উদার উদাস সুর। যাহারা গান করেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে, ভৈরবী গাহিবার পর আর অন্য কোনও সুর হঠাৎ গাহিতে পারা যায় না। যাহাই গাহিতে যাওয়া যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভৈরবী আসিয়া সব গোল করিয়া দেয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন যে, ভৈরবী, উদাস সুর। আমার মনে হয়, উদাস সুরের মজাই এই যে, তাহা একবার মনকে অধিকার করিয়া বসিলে সহজে ছাড়িতে চায় না। রবীন্দ্রনাথের অবস্থা অনেকটা তাই। তাঁহার মন-মজলিসের প্রচ্ছন্ন গায়কটি ভৈরবী গাহিয়া আসর মাটি করিয়া দিয়াছে;—তাহার মধ্যে অন্য কোন সুর তাই আর জমিতে পারে না,—ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভৈরবী আসিয়া পড়ে।

ইহা ছাড়া আর একটি কারণও আছে, যে জন্য এই বিশ্ব-সৃষ্টি অনেক সময় তাঁহার নিকট বড় করুণ, বড় বিষাদময় বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টি চির-স্থায়ী নয় বলিয়া তাহার বুকের মধ্যে একটি করুণ সুর অনেক সময় আপনা হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টির এই অসম্পূর্ণতার বেদনা রবীন্দ্র-নাথের চিত্তকে অনেক সময় ব্যথাতুর করিয়া তুলে—তাঁহার দরদী চিত্তে একটি করুণ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। তত্ত্বের দিক দিয়া অসম্পূর্ণতার মধ্যে যেমন সম্পূর্ণতার, সীমার মধ্যে যেমন অসীমের ইঙ্গিত রহিয়াছে, রসের দিক দিয়া তেমনি কবি দেখিতেছেন সৃষ্টির এই অসম্পূর্ণতার মধ্যে, এই 'চলিয়া যাওয়া', এই 'ফুরাইয়া যাওয়ার' মধ্যে একটা বিষাদের সুর, একটি ব্যথার দীর্ঘনিশ্বাস মিশাইয়া রহিয়াছে। তাই ধরণীর এই অসম্পূর্ণ-তার বেদনা কবিচিত্তকে কেমন যেন ব্যথাতুর করিয়া তুলে। কবি তাই করুণ সুরে গাহিয়াছেন—

> দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালবাসি
> হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে,
> বেদনা-কাতর মুখে সকরুণ হাসি
> দেখে মোর মর্ম্মমাঝে বড় ব্যথা জাগে।

কবি তাই অনুভব করেন—

> তৃণ ক্ষুদ্র অতি
> তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
> কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব,"
> তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

জননী বসুন্ধরার এই সকরুণ অসহায় অবস্থা কবির চিত্তকে বেদনাতুর করিয়া তুলে।

কবি তাই করুণ কণ্ঠে গাহিয়া উঠেন—

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে
এত ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্তভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে করে খেলা
শুষ্ক পত্র লয়ে ; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলো চুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্র পীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়ন যুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাই বাণী ;
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি।

বসুন্ধরার এই ম্লান মুখ, এই সজল নয়ন কবিচিত্তকে ব্যথাতুর করিয়া তুলে। তাই স্বর্গ হইতে বিদায় লইবার কালে কবির কল্পিত মানসপুত্র বলিতেছেন—

থাক্ স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখ-স্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে

অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত পাপী তাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়,
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্তে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ড গুলি।

সৃষ্টির মধ্যে একটি অসম্পূর্ণতার বেদনা রহিয়াছে; তাই সৃষ্টির দিকে চাহিলে কবির প্রাণে একটি বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসে।

সৃষ্টির এই অসম্পূর্ণতা কবির চিত্তলোকে একটি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। কবির নিকট পৃথিবী স্বর্গ নয়—স্বর্গের আভাস। তাই সৃষ্টির মধ্যে এত ব্যঞ্জনা, এত সঙ্গীত।

সৃষ্টির এই অসম্পূর্ণতা কবির মনে দুইটি ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। সৃষ্টির এই যে অসম্পূর্ণতার বেদনা, ইহা নিজেই একটি রস-বস্তু। ইহার মধ্যে যথেষ্ট সঙ্গীত, যথেষ্ট ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। আবার অপর দিক হইতে এই অসম্পূর্ণতার বেদনা তাঁহাকে বৃহত্তর ও মহত্তর পরিণতির সন্ধানে ছুটাইয়াছে; সেখানেও কবি যথেষ্ট রসের সন্ধান পাইয়াছেন। সৃষ্টি পরিণতির পথে চলিয়াছে, তাহার এই অভিসার কবিকে আর একটি নূতন রসের আস্বাদ দিয়াছে—যাহা অপূর্ব্ব এবং অভিনব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথের অনেক নিসর্গ-কবিতার মধ্যে কোথায় যেন একটা উদাসীনতার ভাব আত্মপ্রকাশ করে। কেমন যেন উড়ো

উড়ো ভাব, কেমন যেন নির্লিপ্ত অবস্থা। কবির এই যে উদাসীনতা ইহার ভিতর একটু কথা আছে। উদাসীনতা বলিতে আমরা বুঝি, লক্ষ্যহীন ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা। কিন্তু তাই বলিয়া উদাসীন মনের কোন কাজ নাই, একথা বলা চলে না। কাজ আছে, কিন্তু সে কাজগুলিকে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সংস্কার শৃঙ্খলিত করে নাই বা নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ঘুম হইতে উঠিয়া শিশুরা অনেক সময় যে ভাবে সৃষ্টির পানে তাকায় অনেকটা সেই ভাব। একটা বিস্ময়—একটা কৌতূহল—বাস্ এই পর্য্যন্ত।

এই যে উদাসীনতা, এই যে নির্লিপ্ততা, ইহার মধ্যে নিজেকে ভুলিবার একটা ইঙ্গিত বর্ত্তমান। নিজেদের লইয়াই ত আমাদের যত কিছু গোলমাল—যত কিছু বন্ধন। আমি বলিতে ত শুধু একটি দুই হাত দুইপাওয়ালা মানুষকেই বুঝায় না, তাহার মধ্যে আছে যে যুগযুগান্তের লক্ষ কোটি সংস্কারের অসংখ্য বন্ধন। কবির এই যে উদাসীনতা, এই যে লক্ষ্যহীনতা, ইহার মূলে এই লক্ষকোটি বৎসরের পুঞ্জীকৃত অসংখ্য সংস্কারের বন্ধন-মুক্তির ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ধরণীর পানে সেই লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীনভাবে চাহিয়া থাকার অনাবশ্যক আনন্দ এবং কৌতূহলটুকু বর্ত্তমান।

এই যে সহজ আনন্দ, এই যে সংস্কারমুক্ত লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন অনাবশ্যক তৃপ্তি, ইহাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল উৎস। তাঁহার 'উর্ব্বশী' কবিতা তাঁহার এই সংস্কারমুক্ত হইয়া সহজ চোখে নারীকে দেখিবার একটা প্রয়াসমাত্র। নারীর সহিত যুগযুগান্ত ধরিয়া যে সকল অসংখ্য সংস্কার জড়িত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের জটিলতা হইতে নারীকে মুক্ত করিয়া সহজ এবং অনাবিল দৃষ্টিতে তাহাকে দেখার মূলে তাঁহার এই স্বাভাবিক উদাসীনতার ইঙ্গিতই বর্ত্তমান। রবীন্দ্রনাথের এই

উদাসীনতা যুগযুগান্তের সংস্কার সম্বন্ধে উদাসীনতা—অনুভূত বিষয় সম্বন্ধে নয়। আদিমতম নারীকে দেখিবার দৃষ্টির মধ্যে কবির উদাসীনতা এতটুকু নাই, কিন্তু উদাসীনতা পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে আমাদের নারী-সম্পর্কীয় অসংখ্য সংস্কারের সম্বন্ধে।

তাঁহার নিসর্গ-কবিতার মধ্যে যে উদাসীনতা অনেক সময় ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা অনেকটা এই শ্রেণীর। এই উদাস সংস্কারহীন, উদ্দেশ্যহীন ক্ষণেই কবি প্রকৃতির আদিমতম সত্তায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যেও একটি চিরন্তনী উর্ব্বশী আছেন। জীবনের স্বার্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন উদাস মুহূর্ত্তে কবি এই প্রকৃতিরূপা উর্ব্বশীর রাজ্যে গিয়া পৌঁছান। উর্ব্বশী যেমন মাতা নন্, কন্যা নন্, বধূ নন্—চিরন্তনী নারী। প্রকৃতিও তেমনি কবির নিকট তাঁর এই উদাস সংস্কারমুক্ত ক্ষণটিতে সেই আদিমতম প্রকৃতি,—সেই নদ নয়, নদী নয়, পর্ব্বত নয়, প্রান্তর নয়,—সেই আদিম চিরন্তনী প্রকৃতি,—যেখান হইতে অহরহ—

অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে,—গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষ সুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাব স্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু ;—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্প-ধেনু,

তাই মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতার মধ্যে উদাসীন মনকে উধাও করিয়া দিয়া কবি যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তখন তাঁহার মনে হয়—

আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্ম স্থলে
বহুকাল পরে, ধরণীর বক্ষতলে
পশু পক্ষি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্ব্বজন্মে,—জীবনের প্রথম উল্লাসে।

এই উদাসীন দৃষ্টি, এই কিছু না চাওয়ার, কিছু না পাওয়ার অহেতুকী তৃপ্তি, এই সংস্কারমুক্ত অবস্থা, প্রকৃতির মধ্যে নিজের মনকে লক্ষ্যহীন ভাবে বিছাইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া থাকার এই অনাবশ্যকতা রবীন্দ্রনাথের রস-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই অবস্থাতেই কবি মধ্যে মধ্যে অনির্ব্বচনীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন। আমরা যখন নিজেরাই চেঁচাইতে থাকি তখন সৃষ্টির বুকের নীরব অনাহত সঙ্গীতটি আমরা শুনিতে পাই না। তাই কবি বলিতেছেন—

"চুপ করিলেই সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাঁর সেই সর্ব্বাঙ্গের কথা শোনা যায়।"

কবি আরও বলিতেছেন—

সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন পানে
চেয়ে আছে প্রভাত-রবি।

কবির নিসর্গ-কবিতার মধ্যে যে উদাস কর্ম্মহীন ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে তাঁর রসসাধনার ইতিহাসের এই সূক্ষ্ম সূত্রটির ইঙ্গিত কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সন্ধ্যার মধ্যে লক্ষ্যহীন, সংস্কার-

হীন, কর্ম্মকোলাহলহীন, স্বার্থসম্পর্কহীন একটি উদাসীনতার ভাব আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। দ্বিপ্রহরের উদার শান্ত দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের বুকেও এই ভাবটিই পরিস্ফুট; তাই কবি ইহাদিগকে নিজের মনোভাবের প্রতীক-স্বরূপ কবিতায় বার বার ব্যবহার করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। জগৎকে অহেতুক এই সহজ আনন্দের ভিতর দিয়া দেখার যে তৃপ্তি, তাহা কবি অতি চমৎকার করিয়া তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় তাঁহার "বোষ্টমী" নামক গল্পের একস্থানে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"ব্যাপারটা নিতান্তই সাদা, অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসর রৌদ্রে ল্যাজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে, তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড় অপরূপ হইয়া দেখা দিল। একথা বলিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম।"

এই সহজ আনন্দময় জীবনেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবি গাহিয়াছেন—

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও
আমায় আনন্দে ভাসাও!
না জানি তর্ক, না জানি যুক্তি
না জানি বন্ধ, না জানি মুক্তি
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী
আমার অন্তরে শুনাও।

যে উদাসীনতা, যে কর্ম্মহীনতা রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-কবিতার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই একই উদাসীনতা, একই কর্ম্মহীনতা তাঁহাকে সত্য, মিথ্যা, যুক্তি, তর্ক, মুক্তি, বন্ধন, ভাল, মন্দ প্রভৃতি সকল সংস্কার সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। যে উদাসীনতা, যে কর্ম্ম-হীনতা তাঁহাকে প্রকৃতির মধ্যে একান্তভাবে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করিয়া বিলীন করিয়া দিয়াছে, সেই একই উদাসীনতা, একই কর্ম্মহীনতা ভূমানন্দের অতলের তলে তাঁহার আমিত্বকে কোথায় লুকাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে এই সহজ জীবনেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়াই কবি যে সৃষ্টিকে ভালবাসিয়াছেন তাহা বলিলে হয় ত ঠিক কথা বলা হইবে না; বরং এ কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, কবি সৃষ্টিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াই এই সহজ জীবনেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন; তাই সৃষ্টি কবির নিকট বন্ধন নয়। তাই ছন্দের বন্ধন যেমন ভাবের মুক্তির সূচনা করে, সৃষ্টির সীমাবন্ধন তেমনি কবির নিকটে অসীমের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে। তাই কবির নিকট সীমার জগৎ, মরণের জগৎ মায়া নয়,—সত্য। তাই মায়ার প্রতি কবির এত মায়া, এত আকর্ষণ; তাই প্রকৃতি এত সুন্দর, এত ব্যঞ্জনাপূর্ণ, এত সঙ্গীত-ময়। প্রকৃতি কবির নিকট যে সুদূরের সেই প্রিয়তমের পুষ্পগন্ধি বিরহ-লিপি; তাহা বার বার পাঠ করিয়াও যে কবির তৃপ্তি নাই।

সকল দিক হইতে দেখিয়া মনে হয় কবির মধ্যে কোথায় দুঃখের প্রতি একটা অজানা সহজ টান আছে। তাই বলিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় যাহাকে Pessimist বলে, সে শ্রেণীর লোক নন্। তাঁহার এই বিষাদ-প্রিয়তার মূলে সৃষ্টির প্রতি কোন অবিশ্বাসের ইঙ্গিত নাই। তিনি দুঃখকে, অবসাদকে ভালবাসিয়াছেন বোধ হয় এই কারণেই যে তাহার মধ্যে খুব বেশি ব্যঞ্জনা আছে। সুখ জিনিষটা বড্ড বেশি সীমাবদ্ধ, বড্ড

বেশি স্থূল। কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখই তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়,—ইহা তাহার পথ মাত্র। এই দুঃখ এবং অবসাদ তাঁহাকে ক্রমাগত সুমুখের পানে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই দুঃখবোধ তাঁহাকে কোন দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেয় নাই, ক্রমাগত পরিপূর্ণতর সার্থকতার দিকে তাঁহাকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে 'খেয়া' রচনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কবি দুঃখকে অজানিত ভাবে বরণ করিয়া আসিয়াছেন। মাঝে মাঝে এই দুঃখবোধ তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার নূতন করিয়া তিনি ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। এত-দিন পর্য্যন্ত এই বিষাদের সুরটি, এই দুঃখের এবং অবসাদের সুরটি, এই অতৃপ্তির সুরটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই তিনি বার বার ইহাকে তাঁর কবিতার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তিনি ঠিক স্পষ্ট করিয়া জানিতেন না, এই দুঃখের সুর, এই বিষাদের সুর তাঁহাকে কোন্ অজানা সার্থকতার দিকে চুপি চুপি একটু একটু করিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছে। 'খেয়ার' মধ্যে আসিয়া কবি স্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন—এই দুঃখপ্রিয়তা, এই বিষাদের সুর, এই অজানা অবসাদ তাঁহাকে যে এতদিন নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল, ইহা শুধু রসের দিক দিয়া তাঁহার মধ্যে সার্থক হইয়া উঠে নাই, ইহা শুধু কেবল একটা রস-বিলাসের সহায়তা মাত্র করে নাই, তাহার সহিত আরও অনেক কিছু করিয়াছে। ইহা তাহার মধ্যে শুধু কেবল একটা অজানা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—ইহা তাহাকে সচেতন ভাবে একটি পরি-পূর্ণতর সার্থকতার দিকে পরিচালিত করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা তাঁহাকে শুধু কেবল অজানা রসের সন্ধান দেয় নাই, তাঁহাকে একটি চিরন্তন রসিকের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছে। তাই দুঃখের প্রতি, অবসাদের প্রতি কবির এত প্রাণের টান। তাই খেয়ার পর

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালিতে কবি দুঃখের আর এক নূতন রূপ দেখিয়াছেন।

দুঃখ আমার ঘরের জিনিষ,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস্,
তোর, প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস্
এ মোর অহঙ্কার॥

—গীতাঞ্জলি

তাই কবি 'দুঃখের অশ্রুধার' দিয়া তাঁর ঈপ্সিততমের অর্ঘ্যথালাটি সাজাইয়া তুলিতে চান—

তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ
দুখের অশ্রুধার!

—গীতাঞ্জলি

কবি এতদিন দুঃখকে ভালবাসিতেন দুঃখের জন্যই। কারণ, দুঃখের মধ্যেই একটা অজানা ব্যঞ্জনা লুকাইয়া আছে, যাহা সুরের মত নিজেকে ছাড়াইয়া অনেকখানি ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, যাহা ফুরাইয়া গিয়াও ফুরাইতে চায় না, একটা রেশ রাখিয়া যায়—একটা অনুরণন ধ্বনিত করিয়া তুলে। দুঃখের অন্তর্নিহিত এই ব্যঞ্জনাসম্পদই এতদিন কবিকে মুগ্ধ করিয়াছিল। আজ কিন্তু কবি কেমন করিয়া টের পাইয়া গিয়াছেন—এই যে তাঁর অহেতুক দুঃখপ্রিয়তা, ইহা শুধু একটা স্বপ্নবিলাস মাত্র নয়, ইহার মূলে প্রকাণ্ড একটা সত্য নিহিত রহিয়াছে। ইহা তাঁহাকে শুধু

কেবল আপনার চারিদিকেই ঘুরাইয়া মারে নাই, ইহা তাঁহাকে সুমুখের দিকে, নির্দ্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে অলক্ষিতে চালাইয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা তাঁহাকে অজানিতভাবে তাঁর ঈপ্সিততমের দ্বারপ্রান্তে আনিয়া হাজির করিয়াছে।

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে।
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।

তাই—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামলো।

এই দুঃখের, এই ব্যথার পথ দিয়াই যে সেই অজানা পথিক কবির মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন্‌

ব্যথা পথের পথিক তুমি
চরণ চলে ব্যথা চুমি।

কবির এই দুঃখপ্রিয়তা, এই অবসাদ, এই অতৃপ্তি "সন্ধ্যাসঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া অজানিতভাবে কেমন করিয়া কবির সমস্ত কাব্য-গ্রন্থগুলির তলে তলে চুপি চুপি অলক্ষিতে বহিয়া আসিতেছিল এবং 'খেয়ার' মধ্যে আসিয়া কেমন করিয়া তাহা কবির নিকট সচেতন হইয়া

উঠিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কবির প্রেমের কবিতার মধ্য দিয়া এই অবসাদের সুরটি কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করা যাক্। কবির নিসর্গ-কবিতার ভিতর দিয়া এই অবসাদের সুরটি কেমন করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কিছু পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এখন কবির প্রেমের কবিতাগুলির ভিতর হইতে ইহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিবার চেষ্টা করা যাক্।

এই অবধি শুনিয়া অনেকের হয়ত ধারণা হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ বুঝি জীবনকে এবং সৃষ্টিকে ঠিকমত ভোগ করিতে পারেন নাই ;— কোথায় বুঝি ক্ষুণ্ণতা রহিয়া গিয়াছে। ঠিক তাহা নয় !—কবি জীবনকে যথেষ্ট উপভোগ করিয়াছেন এবং এই দিক হইতে তিনি যে সকল কবিতা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অনবদ্য এবং অপূর্ব্ব। সেখানে কবি বর্ত্তমান জীবনকে একটি পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্তারূপেই দেখিয়াছেন। কিন্তু ইহাই কবির শেষ কথা নয়। তাই ইহার পাশাপাশি আর একটি ভাব-ধারা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। সেখানে অবশ্য কবি তাঁর ঈপ্সিত-তমের, তাঁর চরম লক্ষ্যের সন্ধান পান নাই বটে, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে কবি মধ্যে মধ্যে এই বর্ত্তমান জীবনকে একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্তারূপে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই ; তাই তাঁর নিসর্গ-কবিতার মধ্যে দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বর্ত্তমান জীবনকে অনন্ত সৃষ্টি-লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আলাদা করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিবার ধারা, আর একটি বর্ত্তমান জীবনকে অনন্ত সৃষ্টিলীলার সহিত সংযুক্ত করিয়া ভোগ করিবার ধারা ; প্রথম ধারাটির সহিত পাঠককে নূতন করিয়া পরিচিত করাইয়া দিবার বোধ হয় দরকার করে না। এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবধারার সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। এই শ্রেণীর ভাব-

ধারার পরিচয় আমরা পাই তাঁর 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। এই সকল কবিতার মধ্যে কবি শুধু কেবল বর্ত্তমান জীবনকে উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই,—তাহাকে লক্ষ কোটি পূর্ব্বজন্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া ভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবি এখন অখণ্ড সৃষ্টিধারার সহিত পা ফেলিয়া চলিতে চান। খণ্ডসৃষ্টির মধ্যে চুপ করিয়া বাঁধা তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। তাঁর মনে হয়, এই যে ধরণী, ইহার সহিত তাঁর ভোগের সম্পর্ক আজিকার শুধু নয়; তাই বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের ; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি,—

তাই কবির মনে হয়, এই যে ধরণীকে তিনি উপভোগ করিতেছেন, এই যে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিতেছে, ইহা অহেতুক নয়, ইহার মূলে একটি প্রচ্ছন্ন কারণ লুকাইয়া রহিয়াছে।

এই যে পৃথিবীর অসংখ্য দৃশ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করে ইহার কারণ পৃথিবীর এই সকল সৌন্দর্য্যের সহিত কবির লক্ষজন্মের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

তাই আজি কোনো দিন শরৎ কিরণ
পড়ে যবে পক্ক শীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র পরে,

নারিকেল দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্ব্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে—
আকাশের নীলিমায়।

তাই সমুদ্রের বর্ণনা করিতে বসিয়া কবির মনে পড়িয়া যায় কত জন্মজন্মান্তরের কথা।

মনে হয় যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ঐ বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে- লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ;—
গর্ভস্থ পৃথিবীপরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

তাই মধ্যাহ্নের নির্জ্জনতার মধ্যে কবির মনের একাংশ যখন বর্ত্তমান জীবনের সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতেছে,

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরী পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গরু চরে

শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাট তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝটপটি। শ্যামশষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।

তখন তাহার মনের অপর অংশ বলিয়া উঠিতেছে—

আমি মিলে গেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে, ধরণীর বক্ষতলে
পশুপাখী পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্ব্বজন্মে,—জীবনের প্রথম উল্লাসে,
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে।

এই যে বর্ত্তমান জীবনকে ছাড়াইয়া জন্মান্তরে ফিরিয়া চলিয়া যাওয়ার মনোবৃত্তি, ইহার মূলে কবির রসজীবনের একটি নূতন ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এই ধারাটি আরম্ভ হইয়াছে 'মানসী' হইতে। 'মানসীর' মধ্যে আমরা দেখিতে পাই কবি তাঁর প্রিয়ার সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে গিয়া বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে এই ভোগকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। তাই প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার

তাহার মনে হয়—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।

এই যে পূর্ব্বজন্মে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা, এই যে সৃষ্টির আদিতে চলিয়া গিয়া বর্ত্তমান জীবনের সৌন্দর্য্যভোগের উৎস-সন্ধানে অভিযান, ইহার মূলে কবির একটি বিশেষ চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবির এই বিশেষ চিত্তবৃত্তিটি মানসী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেই পরিণতির দিকে চলিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাবধারাটি পরিণত হইতে হইতে কবিকে ক্রমে সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরও পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। 'খেয়াতে' আসিয়া দেখা যায় কবি সৃষ্টির আদি যুগের সন্ধান পাইয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না,—তিনি আরও আদিতে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—তিনি আরও 'সুদূরের পিয়াসী' হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি এখন আদিমতম কারণে গিয়া না পৌছান পর্য্যন্ত কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছেন না। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালিতে এই সুরটি একটু একটু করিয়া উদারা মুদারা হইতে ক্রমে তারায় গিয়া পৌছিয়াছে। গীতালিতে আসিয়া ইহা চরমে পৌছিয়াছে। সেখানে সৃষ্টি পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে,—আছেন, কেবল কবি নিজে এবং তাঁহার ঈপ্সিততম চরম লক্ষ্য সেই আদি কারণ। এখন আর কবি শুধু পূর্ব্বজন্মে গিয়া বা সৃষ্টির আদিমতম যুগে গিয়া ইহজীবনের

সার্থকতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছেন না ; তিনি এখন আর শুধু ইহজীবনকে জন্মজন্মান্তরের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া ব্যাপ্তির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারিতেছেন না ; এখন তিনি আর শুধু কেবল এইটুকু জানিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না যে এই জীবনটা সীমাবদ্ধ একটা কালের খণ্ড মাত্র নয়, ইহা অসীমকালের সহিত সংযুক্ত একটা অখণ্ড ধারা ; এখন তিনি আদিমতম মহাকারণে গিয়া পৌছিতে চান ; এখন তাঁর মনের ইচ্ছা—

যেন আমার গানের শেষে
থাম্‌তে পারি সমে এসে

তিনি চান-

যেন এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা।

তিনি এখন কূল হইতে অকূলে তরী ভাসাইয়া দিতে চান।

কূল হতে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে;—
সাগরমাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে!
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে
সেখানে নয়!
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে
সেখানে নয়।

যেখানে নীল মরণলীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

কবির এই কূল হইতে অকূলে তরী ভাসানর পূর্ব্বে আমরা তাড়াতাড়ি এ-কূলের পালা সাঙ্গ করিয়া লই। তার পর কবির সহিত আমরা অকূলে যাত্রা করিব। অকূলে তরী ভাসানর পূর্ব্বে এখানকার এই মাটির পৃথিবীতে বাস করিয়া কবি দুইটি জিনিস ভোগ করিয়া গিয়াছেন, একটি প্রকৃতি, অপরটি নারী। কবির নিসর্গকবিতার সহিত আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় হইয়াছে, এখন কবির মর্ত্ত্যবাসিনী প্রিয়ার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভের চেষ্টা করা যাক।

# রূপ-জগৎ

## নারী

রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক কবি। যে প্রেম তাঁহাকে সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়াছে, যে প্রেমের নিগূঢ় অনুভূতি তাঁহাকে সৃষ্টির অণুপরমাণুর মধ্যে চিরসুন্দরের আভাস দেয়, সেই একই প্রেমানুভূতি, সেই একই সৌন্দর্য্য-বোধ, ধর্মবোধ তাঁহাকে নারীর সৌন্দর্য্যেও মুগ্ধ করিয়াছে। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয় লালসার দিকটি অত্যন্ত বেশি ফুটিয়া উঠিয়াছে; আমার কিন্তু ঠিক বিপরীত ধারণা। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার মধ্যে বরং লালসার দিকটাই কম। তাঁহার অধিকাংশ প্রেমের কবিতার মধ্যেই এমন একটি করুণ বিষাদময় সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, যাহা লালসা উদ্রেক করিবার পক্ষে একেবারেই উপযোগী নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রবন্ধে চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমের কবি হিসাবে আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে দুঃখের কবি বলা যাইতে পারে। এখানে কিন্তু একটা কথা আছে। রবীন্দ্রনাথকে দুঃখের কবি বলাতে অনেকে হয়ত মনে করিবেন, আমরা বুঝি তাঁহাকে সেই শ্রেণীর লোকেদের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে চাই ইংরাজীতে যাহাদিগকে Pessimist বলে। তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন আমরা বুঝি রবীন্দ্রনাথকে সেই সকল লোকের শ্রেণীভুক্ত করিতে চাই সৃষ্টির মধ্যে যাহারা কোন সৌন্দর্য্য, কোন আনন্দের সন্ধান পান না; সৃষ্টিটা যাহাদের নিকট কেবলি দুঃখময়, কেবলি যন্ত্রণাময়, কেবলি কষ্টদায়ক

একটা যন্ত্রমাত্র যাহার মধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা অহোরাত্র কেবল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছি। একপ্রকার দুঃখ আছে যাহা আমরা ভোগ করি সৃষ্টিটাকে অসুন্দর চোখে দেখিয়া। যাহা অসুন্দর তাহা ত আমাদিগকে পীড়া দিবেই। কিন্তু আর এক শ্রেণীর দুঃখ আছে যাহা আমরা ভোগ করি জগৎটা অত্যন্ত বেশি সুন্দর বলিয়া। সুন্দরের মধ্যেই কোথায় একটি অপরিসমাপ্তির ইঙ্গিত আপনা হইতে থাকিয়া যায়। সুন্দরকে ভোগ করিয়া শেষ করা যায় যায় না, তাই তাহার মধ্যে একটি অপরিসমাপ্তির বেদনা আপনা হইতেই থাকিয়া যায়। তাহার সহিত বুঝি বা জন্মজন্মান্তরের কত অস্পষ্ট স্মৃতি, কত ব্যথা, জাগিয়া উঠে।

> "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্,
> পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং,
> ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"
>
> অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

"অত্যন্ত সুখী ব্যক্তিও যে মনোহর বস্তু দর্শন এবং সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যথিত চিত্ত হইয়া উঠে; তাহার কারণ এই সকল মনোহর দৃশ্য এবং সুমধুর ধ্বনি অজ্ঞাতসারে তাহাদের মনের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের অনেক ভালবাসার স্মৃতি জাগাইয়া তুলে।"

রবীন্দ্রনাথের অবস্থা অনেকটা এই শ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিটাকে অত্যন্ত বেশি ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছেন, ইহার অণুপরমাণুর মধ্যে কবি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস অহরহঃ পাইতেছেন; তাই কবির বেদনার

অন্ত নাই। এই সৌন্দর্য্যবোধের বেদনা কবির প্রেমের কবিতার মধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এ দুঃখ কবির চিত্তকে পীড়িত করে না—অভিভূত করে; এ দুঃখ কবির হৃদয়কে কঠোর নির্ম্মম করিয়া তুলে না—দ্রবীভূত করিয়া দেয়। এ দুঃখের মধ্যে বিক্ষোভ নাই, শান্তি আছে; এ দুঃখের মধ্যে আমরা বিদ্রোহের মত্ততা পাই না, আত্মসমর্পণের পরিতৃপ্তি পাই।

কবির প্রিয়া তাই মিলনরজনীর উৎসববাসরের শয্যাসঙ্গিনী নয়—বিরহরজনীর অশ্রুময়ী প্রেমপ্রতিমা। রবীন্দ্রনাথের প্রেয়সী ধরা দিয়াও ধরা দেয় না; তাহার মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদের সুরটি ব্যঞ্জনার মত জাগিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের নারী ত মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয় যে তাহাকে সংস্কারের সীমাবদ্ধ সুখ দুঃখ দিয়া ভোগ করিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়া বলিব, তাহাকে পাইয়াছি, তাহাকে ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। সে যে বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনার মধ্যে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাকে যে একটুখানি স্থান কালের সীমার মধ্যে ছোট করিয়া, সীমাবদ্ধ করিয়া ভোগ করিয়া শেষ করিয়া ফেলা যায় না। তাইত তাহাকে বুকের মধ্যে পাইয়াও একটি অতৃপ্তির দীর্ঘ নিশ্বাস মনের গভীরতম প্রদেশ হইতে আপনা হইতে বাহির হইয়া আসে।

জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা।

সেই যে আদিম উর্ব্বশী, তাহারি আভাস, তাহারি স্মৃতি, তাহারি চিরন্তন বিরহব্যথা যে কবির মর্ত্ত্যবাসিনী প্রিয়ার সুন্দর চোখদুটিকে এত স্বপ্নময়, এত করুণ, এত ব্যঞ্জনাময়, এত রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার বিরহব্যথা যেমন আভাসিত হইয়া উঠে, কবির মর্ত্ত্যবাসিনী প্রিয়ার মধ্য দিয়া ঠিক তেমনি অখিল মানস-

স্বর্গের স্বপ্নসঙ্গিনী সেই আদিমতম উর্বশীর বিরহব্যথা কবির মনের মধ্যে সকরুণ হইয়া জাগিয়া উঠে। তাই—

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারাণ সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।

তাই পার্থিব প্রিয়ার পানে চাহিয়া কবির মনে হয়—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।'

তাই কবির মর্ত্যবাসিনী প্রিয়া এত সুন্দর, এত করুণ, এত সুরময়, এত বেদনাপূর্ণ। তাই তাহার মিলন তৃপ্তি আনে না, অতৃপ্ত বাসনার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া আনে। এ যেন সেই বৈষ্ণব কবির—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু তনু জুড়ন না গেল।"

তাই চণ্ডীদাসের মত রবীন্দ্রনাথকেও বলিতে হয়—

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।"

ওই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন সলিল
রেখে যায় এই নয়নকোণে।

প্রিয়ার হাসিমাখা মুখখানির স্মৃতি কবির চোখের কোণে দুফোঁটা অশ্রু আনিয়া দিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ দুঃখের কবি। তাহার প্রেমের কবিতা অধিকাংশই বিরহগাথা। সকল সময়েই যে তাহা জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি বুকে করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নয়; কিন্তু সে স্মৃতি অনেকস্থলেই কবির মনের কোন এক নিভৃততম অংশে মগ্নচৈতন্যের মধ্যে সুপ্তাতিসুপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাই তার মর্ত্ত্যবাসিনী প্রিয়াকে বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে স্বতন্ত্র করিয়া, সীমাবদ্ধ করিয়া উপভোগ করিতে গিয়াও কবির মনের অন্তঃস্থল হইতে একটি অতৃপ্তবাসনার দীর্ঘ নিশ্বাস অজানিত ভাবে আপনা হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে! তাই কবির প্রতিদিনকার বিচ্ছিন্ন প্রেমানুভূতির মধ্যেও এত বেদনা, এত অশ্রুজল!

আমাদের প্রতিদিনকার প্রেমলীলার মধ্যেও কবি অধিকাংশ স্থলেই একটি করুণ সুরের আমেজ না জুড়িয়া তৃপ্তি পান নাই। কবির মর্ত্ত্য-বাসিনী প্রিয়ার ছবিটিও কবির নিকট বড় করুণ, বড় শান্ত, বড় বিষাদময়!

কবির প্রিয়ার চোখে এতটুকু ক্ষুধা নাই; বাসনাদীপ্ত নয়নে সে কোনদিন কবির পানে তাকায় নাই; তাই নিমীলিত নয়নকোণ নামিয়া কবির কল্পিত প্রেমিক উদাস হয়ে আকাশের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

> বাহুতে বাঁধি বাহুপাশ,
> সুধীরে বহিতেছে শ্বাস।
> মাঝে মাঝে থেকে থেকে
> আকাশেতে চেয়ে দেখে,
> গাছের আড়ালে দুটি তারা।

প্রাণ কোথা উড়ে যায়,
সেই তারা পানে ধায়,
আকাশের মাঝে হয় হারা।

তাই কবির প্রিয়া—

পা দুখানি ছড়াইয়া পূরবের পানে চেয়ে
ললিতে প্রাণের গান গায়,
গাহিতে গাহিতে গান সব যেন অবসান,
যেন সব কিছু ভুলে যায়।

তাই কবির যৌবনস্বপ্ন এত করুণ, এত বিষাদময়। তাই কবির যৌবন-স্বপ্নে যখন বিশ্বের আকাশ ছাইয়া যায়, তখন সেই স্বপ্নময় ক্ষণটিতে কবির মনের মধ্যে যে সকল মানসীনারীর আবির্ভাব হয়, তাহারা কেহই মিলন রাত্রির উৎসবময়ী শয্যাসঙ্গিনী নয়—বিরহরজনীর অশ্রুময়ী বিষাদিনী নারী

আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে গেছে বিশ্বের আকাশ,
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত ;
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস

কবির যৌবনস্বপ্ন বিশ্বের বিরহিণী নারীদের দীর্ঘনিশ্বাসে ব্যথাতুর।

তাই কবি তাঁর প্রিয়াকে হৃদয় দুয়ারে ঘা দিবার কৌশলটি চুপি চুপি কাণে কাণে বলিয়া দিবার সময় তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন—সে যেন সাজসজ্জা করিয়া ঘটা করিয়া না আসে। সে যেন ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তিতে তাহার হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া না দাঁড়ায়। তাই কবি প্রিয়াকে বলিয়া দিতেছেন—

কাজল বিহীন সজল নয়নে হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ো

নারীর এই অশ্রুসজল করুণ মূর্তি কবিকে মুগ্ধ করে। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ স্থূলের উপাসক নন্। লালসাময়ী, কটাক্ষময়ী নারী অত্যন্ত বেশী স্পষ্ট, অত্যন্ত বেশী স্থূল, অত্যন্ত বেশি বাস্তব। মিলনের পরিতৃপ্তি ভোগের দিক হইতে যাহাই হোক না কেন রসের দিক হইতে উহা বন্ধন। অথচ রস চায় মুক্তি। তাই রসের জগতে বিরহের মূল্য এত বেশি। কবি তাই সুখ অপেক্ষা দুঃখকেই তাঁর জীবনের সঙ্গী করিতে চাহিয়াছেন। তাই কবির অতি শৈশবের রচনার মধ্যেও তাঁর এই দুঃখপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আর কিছু নয়
নিরালায় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর যায়।
তুই দুঃখ তুই কাছে আয়।

সন্ধ্যাসঙ্গীত।

তাই রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার মধ্যেও সুখের প্রতি বিমুখতার পরিচয় পাওয়া যায়—

সুখ বলে—এ জন্ম ঘুচায়ে
সাধ যায় হইতে বিষাদ।

সন্ধ্যাসঙ্গীত।

তাই কবির মনে হয়—

ঘুমাই বা জেগে থাকি মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণ-প্রাণী দিন রাত বসে আছে—
চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস।

> এ প্রাণের ভাঙ্গা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
> ঘুঘু এক বসে বসে গায় এক স্বরে।

তাই পরিণত বয়সে কবি বলিতেছেন ঃ—

> অনেক দুঃখে গেছে বোঝা,
> বেঁধে রাখা নয়ত সোজা,
> সুখের ভিতে নহে তোমার অচল বাসা।

কবির এই বিষাদ-প্রিয়তা তাঁর প্রিয়ার রূপখানিকে পর্য্যন্ত বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছে। কবি তাঁর প্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পাইতে চান না ;— পাইলেই যে গোপন রহস্যটুকু নষ্ট হইয়া যায়, স্বপ্নের মোহটুকু টুটিয়া যায়। এই স্বপ্নই যে কবিকে বস্তুজগতের জড়তা হইতে মুক্তি দিয়াছে ; এই স্বপ্নই যে কবির মনটিকে সীমাবদ্ধতার বন্ধন হইতে অসীমের মুক্তাকাশে উধাও করিয়া দিয়াছে।

বাস্তবকে কবি অত্যন্ত ভয় করেন। বাস্তব আসিয়া পড়িলেই তাহার সহিত সীমা আসিয়া পড়ে। তাই কবি তাঁর প্রিয়াকে বলিতেছেন—

> আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
> সেই ভালো, থাক তাই, তার বেশি কাজ নাই,
> কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙ্গে যায় পাছে।

এই অস্পষ্টতা, এই স্বপ্নাবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রস-সাধনার পরিপূর্ণ সার্থকতাটি লুকাইয়া রহিয়াছে। এই স্বপ্নই যে বহুদূরের সেই অপরিচিতটিকে পরিচয়ের মধ্যে আনিয়া দেয়।

> আমি বলি স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে ?
> যে তুমি মোর দূরের মানুষ সেই তুমি মোর কাছের কাছে।

এই যে ভোগোন্মত্ততা, ইহার সবটাই কবি নিজের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁর মানসীপ্রিয়াকে এই অসংযত ইন্দ্রিয় ভোগের অংশী করিয়া তুলিতে কবির সম্ভ্রমে বাধে;—তাহা হইলে প্রিয়া যে বড় বেশী বাস্তব হইয়া উঠে—বড় বেশী স্থূল হইয়া উঠে। তাই কবির প্রিয়া শুধু 'হাসি মুকুলিত মুখে' সকল সোহাগ সহ্য করিয়াছিলেন—আর কিছুই করেন নাই। প্রিয়ার সম্ভ্রম এত করিয়া বাঁচাইয়াও কবি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যে শান্ত এবং করুণরসের ভিতর দিয়া কবি নারীকে আগাগোড়া দেখিয়া আসিয়াছেন তাহার সহিত এই উন্মত্ততার চিত্র যেন সুরে বাজিতে চাহে না—কোথায় যেন বেসুরা ঠেকে। তাই রাত্রের এই অসংযত উন্মাদনাময় যৌবনলীলার বর্ণনা করিয়া কবি তাঁর কবিতাটি শেষ করিতে পারিলেন না, তাহার সহিত প্রভাতের শান্ত স্নিগ্ধ একটি চিত্র জুড়িয়া দিলেন। রাত্রের সেই উদ্দাম উন্মত্ততা বর্ষারাত্রের দুর্য্যোগের মত অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন কাটিয়া গিয়াছে। কবি প্রভাতে উঠিয়া দেখিতেছেন—

আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্প রাজি,
দূরে দেবালয় তলে উষার রাগিণী
বাঁশীতে উঠিছে বাজি
এই নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
জাহ্নবীতীরে আজি।

দেবি তব সীঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুর রেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খ বলয়
তরুণ ইন্দু লেখা ;
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি
প্রভাতে দিতেছ দেখা

কবির মনের এই সম্ভ্রম, এই শ্রদ্ধা, এই শুচিতা তাঁর 'বিজয়িনী' কবিতাটির ভিতর দিয়া কি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত সৌন্দর্য্য লালসা জাগায় না,—তাহা উচ্ছৃঙ্খলতাকে শান্ত সংযত করিয়া তুলে। নারীর সৌন্দর্য্য কবিকে মুগ্ধ করে, কিন্তু উন্মত্ত করিয়া তুলে না। তাই কবির কল্পিত লাবণ্যময়ী রূপসীটি যখন অচ্ছোদ সরোবর হইতে স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন কবি তখন মুগ্ধ নেত্রে বিস্ময় নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

সোপানে সোপানে তীরে উঠিলা রূপসী,
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু পরে, কটিতটে স্তনাগ্র-চূড়ায়
বাহুযুগে,—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়—
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ

যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তার,--সেবকের মত
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে,—ছায়াখানি রক্তপদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া ;—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।

কি সুন্দর একখানি চিত্র,—কি মনোরম, কি চমৎকার!—এ যেন মূর্ত্তিমতী সুষমা স্বর্গলোক ছাড়িয়া হঠাৎ ভুলিয়া ধরায় নামিয়া আসিয়াছে।

ইহার মধ্যে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার কোথাও অভাব নাই। কিন্তু এমনি একটা শ্রদ্ধা, এমনি একটা শুচিতা রচনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যকে কোথাও উগ্রমদির করিয়া তুলিতে পারে নাই। কবির নিকট নারী যেন প্রকৃতিরই একটি অঙ্গ। প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করিতে বসিয়া কবির যেমন কোন সঙ্কোচ, কোন বাধা থাকে না ; —নারীর রূপবর্ণনা করিতে বসিয়াও তেমনি কবির কোন সঙ্কোচ, কোন দ্বিধা নাই। নারীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা কবি নিপুণভাবে করিয়াছেন,--কিন্তু কোথাও এতটুকু লালসা নাই, এতটুকু উগ্রতা নাই। এ যেন ভক্ত-শিল্পীর দেবীরূপ বর্ণনা। এ যেন রূপদেবতার বেদীপাদমূলে বিমুগ্ধ কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি দান।

তাই এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াই কবি ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না,—এই অপূর্ব্ব রূপসীটির পাদমূলে নিজের অন্তস্তলবাসী অনঙ্গ দেবতাটির মাথা নত করাইয়া দিয়া কবিতা শেষ করিলেন।

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদু মন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব। সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে

চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়নে
ক্ষণকাল তরে! পরক্ষণে ভূমি পরে,
জানু পাতি বসি, নির্ব্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

রবীন্দ্রনাথ নারীর সৌন্দর্য্যমন্দিরের মুগ্ধ পূজারী। নারীর রূপ তিনি দূর হইতে মুগ্ধ সশঙ্ক নয়নে দেখিয়াছেন,—তাহাকে ভোগের সামগ্রী করিয়া তুলিতে তাহার মুগ্ধ শ্রদ্ধানত মনখানি ভিতরে ভিতরে দ্বিধায় সঙ্কোচে ভরিয়া উঠে।

তাই রাজকন্যার নিদ্রিতরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মুগ্ধ কবি বলিতেছেন—

মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে।
একটি বাহু বক্ষ 'পরে পড়ি
একটি বাহু লুটায় একধারে।
আঁচলখানি পড়িছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি,
পত্র পুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।

রাজকন্যার সবুজ পাতলা কাঁচলির অন্তরালে যে মুকুলিত স্তনাগ্রভাগ দেখা যাইতেছিল কবির নিকট তাহা পত্রপুটে ঢাকা দুইটি অনাঘ্রাত অম্লান পূজার ফুলের মত মনে হইল। কি অপূর্ব্ব শুচিতা! কবির মনে যেদিন চপলতা জাগিয়া উঠে সেদিনও নারী তাঁহার নিকট কি অপূর্ব্ব শুচিশীলা হইয়াই না দেখা দেয়!

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা,
তোমারি ললাটে নব বরষার
বরণ ডালা।

জীবনের চপল মুহূর্ত্তেও কবি নারীকে লালসাময়ী মূর্ত্তিতে দেখিতে পারিলেন না।

কবির স্বাভাবিক শান্তরসপ্রধান হৃদয় নারীকে খুব নিকটে আনিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছে, পাছে তাহার মহিমা নষ্ট হইয়া যায়, পাছে নারী তাহার নিকট বড্ড বেশি স্পষ্ট হইয়া উঠে, পাছে তাহার স্বপ্নাবেশ ভাঙ্গিয়া যায়।

কবি যেখানেই নারীকে নিকটে আনিয়া তাহার সহিত অধিক মেলা-মেশা করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেইখানেই

নারীর চিরন্তন রহস্যমাধুরীটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই পুরুষের সহিত কিছুদিন মেলামেশার পর নারীকে বলিতে হয়—

দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ,
আজ সে হৃদয় নাই যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস, বিষাদ সন্দেহ।

তাই কিছুদিন নারীকে উপভোগ করিবার পর ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে। পুরুষকে তখন বলিতে হয়—

কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা।

তাই কবি মিলন চান না—চান চিরবিরহ। তাই দীর্ঘ বিরহান্তে প্রিয়ার সহিত মিলিত হইবার পর কবির স্বপ্নটি যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন কবির অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল—

বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেন রে ?
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।

তাই কিছুদিন মিলনের পর কবিকে বলিতে হয়—

আমি রহি এক ধারে তুমি যাও পরপারে
মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি ;
একেবারে ভুলে যেয়ো শতগুণে ভাল সেও,
ভাল নয় প্রেমের বিকৃতি।

তাই কবি দুঃখকে চান, বিরহকে চান। প্রেমের উৎসব উৎফুল্লতার মূর্ত্তি দেখিয়া কবি তাই মনে মনে শিহরিয়া উঠেন। তাঁর ভয় হয় পাছে উপভোগের বাস্তবতা তাঁহার মধুর স্বপ্নটিকে ভাঙ্গিয়া দেয়। তাই মিলন প্রত্যাশী প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

চাও তুমি দুখহীন প্রেম,
ছুটে যেথা জোছনা লহরী,
বহে যেথা বসন্ত বাতাস ?
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম,
আছে যেথা অনন্ত পিয়াসা,
বহে যেথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস ?

কবির প্রেমের মধ্যে একটি বেদনা, একটি ব্যথা সর্ব্বদা মিশিয়া রহিয়াছে। যৌবনটাই তাঁহার নিকট একটি বেদনার সুরের মত মনে হয়। তাই কবির চিত্তশতদল যেদিন যৌবনের মদিরস্পর্শে প্রথম পাপড়ি মেলিয়া বিকশিত হইয়া উঠিল, সেদিন কবি বলিতেছেন—

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন 'পরে।
প্রভাত কমল সম ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ তরে।
জাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।

আমার বেদনা আজ
ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বন রাজি বেদনা ভরে।

তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন রবীন্দ্রনাথ নারীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন নাই ;—রীতিমতই করিয়াছেন। তবে তাঁহার উপভোগের রীতিটা একটু অন্য রকমের। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ শান্তরসের সাধক। তাই তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যে নারী কোথাও লালসাময়ী মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দেয় নাই। যে শান্তরস রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-কবিতার মধ্যে কোথাও রুদ্ররস আনিতে দেয় নাই, সেই একই শান্তরস কবিকে তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যে কোথাও লালসা বা উন্মত্ততা আনিতে দেয় নাই। তাই তাঁর অতিবড় হাল্কা প্রেমের কবিতার মধ্যেও কোথাও লালসা বা উন্মত্ততা নাই। তাই তাঁর প্রিয়া যখন তাঁর নিকুঞ্জকুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন তাঁহার পদবিক্ষেপ দ্রুতচঞ্চল নয়,—মৃদুমন্থর।

সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে।

প্রিয়া শুধু ধীরে ধীরে আসে না, সে লাজে ফিরিয়া যায়। কবি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে ফিরাইয়া দেন, পাছে অত্যধিক বেশি মেলামেশায় তাঁর সুখস্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া যায়। প্রিয়ার পদবিক্ষেপে কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নাই—কোথাও এতটুকু উগ্রতা নাই। তার—

কোমল পদপল্লবতল চুম্বিত ধরণীরে

এমনি করিয়া কবির প্রেয়া ধীরে ধীরে আসে, কিন্তু কবির নিকুঞ্জ-কুটীরে প্রবেশ করে না—আসে আর ফিরিয়া ফিরিয়া যায়।
কেবল তার—

কুন্তল-ফুল-গন্ধ আসে অন্তর মন্দিরে
উন্মাদ সমীরে।

'খেয়া' পর্য্যন্ত আসিয়া রবীন্দ্রনাথের নিসর্গকবিতা এবং প্রেমের কবিতা একরকম শেষ হইয়াছে। কবি এতদিন নীড়ে বসিয়া গান গাহিতেছিলেন এইবার অসীম আকাশ তাঁহাকে ডাক দিয়াছে। তাই নীড় ছাড়িবার পূর্ব্বে কবির চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছে। তপোবনের নিকট বিদায় লইবার কালে আশ্রমবাসী পালিত হরিণশিশুটি যেমন শকুন্তলার বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া টানিয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া এতদিনকার এই মাটির নীড় তাঁহাকে পিছন হইতে আকর্ষণ করিতেছে। তাই নীড় ছাড়িয়া মুক্তাকাশে উধাও হইয়া যাইবার পূর্ব্বে কবির মনের মধ্যে কত পুরাতন স্মৃতিই জাগিতেছে।

কত আভাস আসা যাওয়ার,
ঝরঝরানি কত হাওয়ার,
বেণুবনের বাঁশের বাঁশি
নিঃশ্বসিত জ্যোৎস্না রাতে,
ঘাসের পাতার, মাটির গন্ধ,
কত ঋতুর কত ছন্দ,
সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল
নীড়ে গাওয়া গানের সাথে

এতদিনকার লক্ষ স্মৃতির বন্ধন ছিঁড়িয়া কবিকে আজ মুক্তাকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতে হইবে। এতকালের এত মোহবন্ধন তাঁহাকে আজ নিজ হাতে ছিন্ন করিয়া নীলাকাশের অসীমতার মধ্যে উধাও হইয়া যাইতে হইবে, তাহারি জন্য ডাক আসিয়াছে। সে ডাক কবির চিত্তকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—

আজ কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জ্জন গান ?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরাণ ?

নীড় যেন আর কবিকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। কবির চিত্তবিহঙ্গম মুক্তাকাশের মধ্যে আজ উধাও হইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর চিরপরিচিত নদীর দুই তীরের আলোছায়ার মোহন দৃশ্য কবিকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

কবি যেদিন প্রথম তরী ভাসাইয়াছিলেন সেদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এই ক্ষুদ্র তরীখানি তাঁহাকে একদিন অকূল সমুদ্রে আনিয়া ফেলিয়া দিশাহারা করিয়া দিবে।

তখন আমি ভাবিনিকো
সূর্য্য যাবে অস্তাচলে,
নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে
পড়ব এসে সাগরজলে।
ঘাটে ঘাটে তীরে তীরে
যে তরী ধায় ধীরে ধীরে
বইতে হবে নিয়ে তারে
নীল পাথারে একলা প্রাণে।

সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়া কবির আর দুঃখ নাই, আর পিছনের টান নাই। অকূল সমুদ্রের অসীমতা কবির চিত্তকে নিমেষে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

> যাক্ না মুছে তটের রেখা,
> নাইবা কিছু গেল দেখা ;
> অতল বারি দিকনা সাড়া
> বাঁধনহারা হাওয়ার ডাকে।
>
> দোসর ছাড়া একার দেশে
> একেবারে এক নিমেষে,
> লও রে বুকে দুহাত মেলি
> অন্তবিহীন অজানাকে।

এইখানেই কবি স্পষ্ট করিয়া মাটির পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন। ইহার পর গীতাঞ্জলির মধ্যে মাটির গন্ধ সামান্য একটু আধটু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু গীতিমাল্য এবং গীতালির মধ্যে কেবলই অনন্ত নীলসাগরের গান আমরা শুনিতে পাই।

'পূরবীর' মধ্যে কবি অনেকদিন পরে আবার তীরে আসিয়া তরী ভিড়াইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁর সেই আলোছায়া দিয়া ঘেরা পুরাতন নীড়টির মধ্যে তিনি পূর্ব্বের মত তেমন নিবিড় ভাবে আপনার পরিত্যক্ত আসনখানি দখল করিয়া বসিতে পারেন নাই। কিন্তু থাক্ সে কথা! এখন কবির সহিত তাঁর নীলসাগর অভিযানের সঙ্গী হইয়া কিছুদিন ঘুরিয়া আসা যাক্।

'নৈবেদ্যের' মধ্যে কবি প্রথম বুঝিয়াছিলেন সৃষ্টিকে ভোগ করাটাই

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এ কথা ঠিক যে, প্রকৃতি তার রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ দিয়া আমাদিগকে অনির্বচনীয় এক আনন্দের সন্ধান দিতেছে। রসের দিক্ হইতে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রস-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জীবনও ধীরে ধীরে অলক্ষিতে গড়িয়া উঠিতেছিল, এটি তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন। কবির এই অধ্যাত্ম জীবন তাঁহাকে শুধু কেবল সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না;—তাঁহার মধ্যে একটা নূতন জিজ্ঞাসা আনিয়া দিল। তাহার ফলে কবির মনে চিন্তা জাগিল,—এই যে সৃষ্টির আনন্দ, এই যে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের আস্বাদন-জনিত পুলকানন্দ, ইহাই কি আমাদের জীবনের শেষ কথা? আমরা কি শুধু আনন্দ এবং রস উপভোগ করিয়াই এখান হইতে চলিয়া যাইব? কবির বুকের ভিতর হইতে উত্তর আসিল—না, তাহা নয়,—আমাদিগকে জানিতে হইবে—এ আনন্দ কিসের জন্য; এ আনন্দের মূলে কোন্ পরম সত্য বিরাজ করিতেছে। ইহা না জানিয়া যে আমরা সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিনা তাহা নয়—কিন্তু ইহা জানিবার পর সৃষ্টিকে আমরা আর এক নূতনভাবে উপভোগ করিতে পারি। এই যে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, এই যে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময় পৃথিবীর আনন্দ—ইহা মিথ্যা নয়,—ইহা অলক্ষিতে সেই পরম সত্যের দিকেই কবিকে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। কবি সেকথা জানেন। তিনি জানেন আমাদের এই সকল সৌন্দর্য্যানুভূতি ব্যর্থ হয় নাই।

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব! অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি' কোন্ অবসরে

বীজেরে অঙ্কুর রূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে,
ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণত গর্ভ।

কবি জানেন, তিনি যত কিছু লিখিয়াছেন জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক—

তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি।

এই যে 'তুমি', যাহার পানে কবির সমস্ত রচনা অজানিতভাবে ইঙ্গিত করিতেছে, এই 'তুমি'কে না জানিয়া কবি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছেন না।

এই 'তুমি'কে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিক হইতে কবির ধর্মজীবন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহাকে কতটা সাহায্য করিয়াছে তাহা আমরা ঠিক জানি না, কেবল এইটুকু মাত্র আমরা জানি যে একদিন সহসা যেন তাঁর মনে হইল সৃষ্টির এই অশান্ত কোলাহলের মধ্যে এই 'তুমি'টি কোথায় নিভৃতে তাঁর 'নির্জ্জন আসনখানি' বিছাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন—

তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহা জনারণ্য মাঝে অনন্ত নির্জ্জন
তোমার আসন খানি।

সেই অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কবির মনে হইল—

শুনিতেছি তৃণে তৃণে, ধূলায় ধূলায়—
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে, সূর্য্যে, তারকায় নিত্যকাল ধরে

অণু পরমাণুদের নৃত্যকলরোল,
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

এই 'তুমির' সন্ধান পাইবার পর হইতে কবি আর এই সৃষ্টিকে আলাদা করিয়া ভোগ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছেন না,—তাহার ভিতর দিয়া তিনি আর একজনকে পাইতে চান।

কবির এখন সাধ যায়—

সবার সহিত তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গে পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয় খানিতে।

এই 'তুমির' সন্ধান পাইবার পর হইতে কবি আর সৃষ্টিকে আলাদা করিয়া দেখিতে পারিতেছেন না ;—সৃষ্টি এখন লক্ষ্য নয়—উপলক্ষ্য মাত্র।

এখন কবি চান—

চলিব যখন তোমার আকাশ গেহে
তব আনন্দ প্রবাহ লাগিবে দেহে।
—নৈবেদ্য।

এতদিন কবির মন তীরে বাঁধা ছিল, আজ অনন্ত নীলসাগরের দূরাগত জলকল্লোল তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

তীর সাথে হের শত ডোরে

বাঁধা আছে মোর তরীখান।

রসি খুলে দেবে কবে মোরে

ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।

কোথা বুক জোড়া খোলা হাওয়া,

সাগরের খোলা হাওয়া কই!

কোথা মহাগান ভরি দিবে কান,

কোথা সাগরের মহাগান।

ইহার পর 'খেয়ার' মধ্যে কবি আবার একবার মনকে সুস্থির করিয়া নীলসাগরে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তাবটা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মন একবার যখন অকূলে পাড়ি দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন আর তাহাকে ফিরান যায় না,—ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই খেয়াল মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। তাই বৈশাখের তপ্ত হাওয়া যখন আমলাগাছের কচি পাতাগুলিকে নাড়াইয়া দিয়া গেল, তখন কবি ভাবিলেন, এই যে—

কেউ কোথা নেই মাঠের পরে,

কেউ কোথা নেই শূন্য ঘরে,

আজ দুপুরে আকাশ তলে

রিনি ঝিনি নূপুর বাজে।

এই যে-

আজি রোদের প্রখর তাপে

বাঁধের জলে আলো কাঁপে,

বাতাস বাজে মর্ম্মরিয়া

সারি বাঁধা তালের বনে

এই যে সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—এইগুলিকে ভোগ করিয়া তৃপ্ত থাকিবেন—ইহাই তাঁহার মনে ছিল, কিন্তু মন তাঁহার ভিতরে ভিতরে আর একজনকে খুঁজিতেছিল। তাই এই সকল দেখিতে দেখিতে যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, তখন মনের মধ্যে কোথা হইতে প্রশ্ন জাগিল—

সারাদিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয়নি ধরা ?
আমার কি মন শূন্য যখন
হল বধির কলস ভরা ?

ইহার পর কবি বুঝিলেন—এই রূপের জগতের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ভিতরে ভিতরে ছিঁড়িয়া গিয়াছে,—তাই 'স্বপন পিয়াসী' মনকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। তাই কবি বলিতেছেন—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পানে খেয়ার তরী ভাসা।

কবির জীবন-তরী এই যে নদীতে ভাসিতে ভাসিতে আজ সমুদ্রের মোহানায় আসিয়া পৌছিয়াছে, ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। এই যে অসীমের সন্ধান কবি 'নৈবেদ্যের' মধ্যে পাইলেন, ইহার আভাস

আমরা ইঙ্গিতে অনেক পূর্ব্ব হইতেই পাইয়া আসিতেছি। তবে 'নৈবেদ্যে' আসিয়া কবি ইহার সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হইয়াছেন এবং গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালিতে তাঁহার এই সচেতন অবস্থা ক্রমেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। নৈবেদ্যের অনেক পূর্ব্ব হইতেই কবির কাব্য-সাধনা এই অসীমের পানেই অলক্ষ্যে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সুতরাং কবির এই অসীম এবং অরূপে পৌছিবার পথে আমরা তাঁহার কি কি পাথেয়ের সন্ধান পাই তাহা খুঁজিয়া দেখিলে হয়ত তাঁহার এই তীর্থ-যাত্রার ইতিহাস সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হইতে পারিব।

এখন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'খেয়া' পর্য্যন্ত এই ক্রমপরিণতির ধারাটি কোন্ পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি পরিচয় লইবার চেষ্টা করা যাক্।

# অরূপের পথে

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া কবির যে বিশেষ মানসিক বৃত্তিটিকে আমরা তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিতে দেখি, তাহা তাঁর দুঃখানুভূতি। এই দুঃখানুভূতি কবির প্রথম বয়সের রচনা হইতেই আমরা পাইয়া আসিতেছি। কবির এই অজানা অহেতুক দুঃখবোধ কেমন করিয়া তাঁর কাব্যজীবনের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইয়া গিয়া তাঁহার সমগ্র রসজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার মূলে বরাবর প্রাণ সঞ্চার করিয়া আসিয়াছে, তাহার সূক্ষ্ম ইতিহাসের ক্রমসূত্রটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে রবীন্দ্রনাথের রসজীবনের ক্রমপরিণতির একটি অশ্রান্ত ধারা আমরা অনায়াসে আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারিব।

এই সূক্ষ্ম ধারাটিকে অনুসরণ করিয়া বরাবর চলিয়া আসিলে আমরাও হয়ত কবির সহিত অকূল সমুদ্রের মোহানায় পৌঁছিতে পারিব। এখন এই সূক্ষ্ম ধারাটিকে অনুসরণ করিয়া দেখা যাক্, ইহা কেমন করিয়া আপনাকে মহাসমুদ্রে আনিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমরা এই পর্য্যন্ত দেখি যে কবি দুঃখকে চাহিতেছেন।

দুঃখ তুই আয় তুই আয়।
নিতান্ত একেলা এ হৃদয়।

*   *   *   *

আর কিছু নয়
নিরালয় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়।
তুই দুঃখ তুই কাছে আয়!

এখানে আমরা দেখিতে পাই দুঃখ যেন ভূতের মত কবিকে পাইয়া বসিয়াছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতের সকল কবিতার মধ্যেই এই দুঃখানুভূতির লক্ষণ পরিস্ফুট।

এই যে দুঃখবোধ, এই যে নিরাশার দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাসঙ্গীতের প্রায় প্রত্যেক কবিতার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহাকে আমরা একবারেই ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের এই সকল কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের ক্রম-পরিণতির ইতিহাসের ধারা হইতে যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, তাহা হইলে এই সকল কবিতাকে আমরা অবান্তর বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম ; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় ইহারা একেবারেই তাহা নয়। ইহাদের সহিত কবির পরবর্ত্তী জীবনের কবিতাগুলির রীতি-গত একটি ক্রমসম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই ক্রমসূত্রটির সন্ধান পাইলে আমরা যে শুধু সন্ধ্যাসঙ্গীতের সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিব তাহা নয়, তাঁহার কাব্যজীবনের ক্রমপরিণতির ইতিহাসের একটি সূক্ষ্ম-সূত্রও হয়ত আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারিব।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবের কবিতাগুলির সহিত যে তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের কবিতাবলীর একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে, তাহা আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি কবির মৃত্যুবিষয়ক কবিতাগুলির দিকে চাহিয়া।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে 'পরিত্যক্ত' বলিয়া একটি কবিতা আছে। এই কবিতাটির মধ্যে কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—দুনিয়ার সকল জিনিষ চলিয়া যায়, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এ দুনিয়ায় কিছু যদি শুনাইবার থাকে, কিছু যদি গাহিবার থাকে, তবে তাহা এই যে—সবই চলিয়া যায়।

চলে গেল! আর কিছু নাহি কহিবার!
চলে গেল! আর কিছু নাহি গাহিবার!
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীন হীন হৃদয় আমার,
শুধু বলিতেছে
চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল, দলে গেল গো!

* * * * * *

উৎসব ফুরায়ে গেলে ছিন্ন শুষ্ক মালা
পড়ে থাকে হেথায় হোথায়।
তৈলহীন, শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি
ধূলায় লুটায়!
একবার ফিরে কেহ দেখে নাক ভুলি
সব চলে যায়।

এই যে দুনিয়ার সমস্ত বস্তুই চলিয়া যায়,—সৃষ্টির মধ্যে এই যে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, ইহা কবিকে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়া দেয়।

মৃত্যু চিরদিনই রবীন্দ্রনাথকে ভাবাইয়াছে। চিররহস্যময় মৃত্যু কবির চিত্তদোলাকে শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত নানান দিক্ হইতে নানান ভঙ্গিতে দোলা দিয়া আসিতেছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসম্বন্ধীয় কবিতাগুলির সহিত তাঁর দুঃখবোধের কবিতাগুলির একটা নিকট-সম্পর্ক রহিয়াছে। কবির জীবন এবং মৃত্যু তাঁর কবিতার ভিতর দিয়া একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি।

রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলি নিছক্ দুঃখানুভূতির কবিতা। ইহার মধ্যে আমরা পাই কেবল তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আর নৈরাশ্যের হাহুতাশ। কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও আশা ভরসার লেশমাত্র নাই।

জীবনের ভিতর দিয়া কবি কোথাও কোন আশা-ভরসা পাইতেছেন না। জীবন তাঁহার কাছে নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং খাপছাড়া বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ কবি দেখিতেছেন, দুনিয়ার সকল বস্তুই চলিয়া যায়। কবির নিকট জীবন অনিশ্চিত এবং অচিরস্থায়ী। কবি দেখিতেছেন, মৃত্যু আসিয়া জীবনকে হঠাৎ একদিন শেষ করিয়া দেয়; তার পর সব শেষ হইয়া যায়, তার পরের কথা কবি কিছুই জানেন না,—জানিবার মত মনের অবস্থাও তাঁহার নয়। তাই "জ্যোতির্ম্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে" একটি তারকা যখন খসিয়া পড়িল, তখন কবি বড় দুঃখে বলিতেছেন—ঐ তারকাটিকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, কেন সে এমন করিয়া আত্মহত্যা করিল, তাহা হইলে—

আমি জানি কি যে সে কহিত!
যত দিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কি তারে দহিত!
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না।

তারপর কবি বলিতেছেন—

জলন্ত অঙ্গার খণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে।

তেমনি তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত দহিত তারে—দহিত কেবল !

সৃষ্টি সম্বন্ধে কি নিদারুণ অবিশ্বাস ! মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা, ইহা যখন আমরা মনে করি, তখন সৃষ্টিকে এইরূপ চক্ষে দেখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর কোথায় ? জীবনটা দিনে দিনে, তিলে তিলে ক্ষয় হইয়া মৃত্যুর দিকে প্রতি মুহূর্ত্তে অগ্রসর হইতেছে এবং একদিন তাহা চিরদিনের জন্য শেষ হইয়া গিয়া সৃষ্টি হইতে মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, ইহাই যদি কাহারও মনের ধারণা হয়, তাহা হইলে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি, তা' সে সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক, আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এ অবস্থায় সৃষ্টিটাকে কে না জ্বলন্ত অঙ্গারের সহিত তুলনা করিয়া কবির সহিত বলিবে—

জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে কবি জীবন সম্বন্ধে যে পরিমাণে অবিশ্বাসী এবং নিরাশাসম্পন্ন, মৃত্যু সম্বন্ধে ঠিক সেই পরিমাণেই নীরব এবং আস্থাহীন। এখানে কবি মৃত্যুর ধ্বংসের দিকই কেবল দেখিয়াছেন, তাহার আর এক দিক্ একেবারেই দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে জীবনটাও তাঁহার নিকট একেবারেই নিরর্থক এবং আশাহীন, ভরসাহীন, খাপছাড়া একটা কিছু বলিয়া মনে হইয়াছে। তাই ঐ মৃত তারকাটিকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি বড় দুঃখে বলিতেছেন—

হৃদয় হৃদয় মোর, সাধ কিরে যায় তোর
ঘুমাইতে ঐ মৃত তারাটির পাশে ?
ওই আঁধার সাগরে !
ওই গভীর নিশীথে !
ওই অতল আকাশে !

মৃত্যু কবির নিকট "আঁধার সাগর" ! সেখানে আলোকের লেশমাত্র নাই। ইহাই যদি জীবনের শেষ পরিণতি হয়, তাহা হইলে কবিকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হয়—

চলে গেল ! আর কিছু নাহি কহিবার,
চলে গেল ! আর কিছু নাহি গাহিবার।

এরূপ অবস্থায় মানুষ অনেক সময় অতিরিক্ত রকম বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠে। জীবনটা যখন হঠাৎ একদিন শেষ হইয়া যাইবে এবং তাহার পর ইহার আর কোন চিহ্নই থাকিবে না, তখন যে-কটা দিন বাঁচিয়া আছি আকণ্ঠ সুখভোগ করিয়া লইতে আপত্তি কি ? এইরূপ মনোবৃত্তি এরূপ-স্থলে কিছুই অস্বাভাবিক নয়। আবার অনেক সময় এইরূপ ধারণা হইতে মানুষের মনের মধ্যে বৈরাগ্যের উদয় হইতেও দেখা গিয়াছে। কিন্তু এ দুটির কোনটিই রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কবিতাগুলির মধ্যে কোথাও আমরা পাই না। ইহার কারণ কি ?—ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবন ক্রমপরিণতিশীল। বাঁধাধরা কোন দার্শনিক মত গোড়া হইতে তাঁহাকে পাইয়া বসিতে পারে নাই। তাই জীবন ক্ষণভঙ্গুর ইহা জানিয়া এবং স্বীকার করিয়াও কবি ইহার দুঃখ এবং অবসাদকে জোর করিয়া ভুলিয়া জীবনটাকে ফাঁকি দিয়া ভোগ করিবার চেষ্টাও করেন নাই, আবার

ইহাকে মায়া বলিয়া অস্বীকার করিয়া ইহার নৈরাশ্য এবং অবসাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টাও করেন নাই। তিনি প্রকৃত শিল্পীর মত এই অবসাদ এবং নৈরাশ্যকেই তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া সুরে পরিণত করিয়া তুলিয়া তাহাকেই উপভোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সন্ধ্যাসঙ্গীতের নৈরাশ্যের মধ্যে একটা মাদকতা আছে, একটা সঙ্গীত আছে।

দুঃখ এবং নৈরাশ্যই যদি জীবনের মধ্যে সত্য হইয়া উঠে, তবে সেই সুরেই কবির চিত্তবীণার তার বাঁধিয়া লইতে ক্ষতি কি? সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে কবি তাহাই করিয়াছেন। মৃত্যুই যদি জীবনের শেষ পরিণতি হয় তাহা হইলে ক্ষণভঙ্গুর, অনিশ্চিত, অসম্পূর্ণ এই জীবনযাত্রার মধ্যে যে করুণ সুরটি নিয়ত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তাহারি সুরে সুর মিলাইয়া গান গাহিয়া যাওয়াতে বাধা কোথায়?

শুধু তাহাই নয়!—এই করুণ সুরটির মধ্যে যথেষ্ট সঙ্গীত রহিয়াছে; অসম্পূর্ণ এই জীবনের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ার মধ্যে রসের অভাব নাই; তাহার মধ্যে আকর্ষণও আছে যথেষ্ট।

কবি তাই দুঃখকে সাদরে বরণ করিয়া লইতেছেন—

আয় দুঃখ আয় তুই! ব্যাকুল এ হিয়া।
দুই হাতে মুখ চাপি হৃদয়ের ভূমি পরে
পড় আছাড়িয়া।

তাই কবি বলিতেছেন—

ঘুমাই বা জেগে থাকি মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণপ্রাণী দিনরাত বসে আছে—

চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস !
এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
ঘুঘু এক বসে বসে গায় এক স্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায় !
গলি সে কাতরস্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায় হায় ।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে দু-একটি প্রেমের কবিতা আছে। কিন্তু তাহার মধ্যেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রেমিক সাধারণতঃ জগতকে ভুলিয়া যাইতে চায় ;—দুইটি হৃদয় ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে চায় না। সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবি কিন্তু আদৌ সেদিক দিয়া যান নাই। তিনি সকলকে ভুলিয়া একজনকে লইয়া মাতিয়া থাকার পক্ষপাতী নন। এরূপ হইবার কারণ কি ? আমার মনে হয় এখানেও সেই দুঃখবোধের জের চলিতেছে—সেই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের নৈরাশ্যের জের। যে মুহূর্ত্তে কবি বুঝিয়াছেন জীবন ক্ষণভঙ্গুর,—আমি, তুমি সকলেই একদিন চলিয়া যাইব,—কেহই চিরদিন থাকিতে আসে নাই, সেই মুহূর্ত্তেই সকলের জন্য সহানুভূতিতে কবির চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে কবির মনে জিজ্ঞাসা উঠিয়াছে—এই বিরাট সৃষ্টি কি বিধাতার অনুগ্রহ মাত্র ?—ইহার মধ্যে কি কোথাও ভালবাসা নাই ?—যে মুহূর্ত্তে কবি বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

এই যে জগত হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামি,

একি হে তোমার অনুগ্রহ ?
হে বিধাতা কহ মোরে কহ।

যে মুহূর্ত্তে কবি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী।
না হয় শুনোনা মোর গান,
ভালবাসা ঢাকা রবে মনে ;
অনুগ্রহ করে এই কোরো
অনুগ্রহ কোরোনা এজনে।

সেই মুহূর্ত্তে তাঁর মনে একথাও জাগিয়াছে যে আমরা সকলেই একই অদৃষ্টের নিষ্ঠুর হস্তের দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের জন্য কবির মন সহানুভূতি এবং করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাই মৃত্যুর ক্রীড়নক জীবের দুঃখে সহানুভূতিপূর্ণ তরুণ কবি তাঁর প্রেমসঙ্গীতের মধ্যেও মরণশীল জীবকে ভুলিতে পারিলেন না। কবি তাই তাঁর কল্পিত প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

চাও তুমি দুখহীন প্রেম,
ছুটে যেথা জোছনা লহরী,
বহে যেথা বসন্ত বাতাস।

এখানেও কবি দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে চান। সমস্ত দুনিয়াটা যখন কাঁদিতেছে, তখন কবি তাঁর প্রেমকে তাহারি সুরে মিলাইয়া লইতে চান, নইলে সমস্তই যে বেসুরা হইয়া বাজিয়া উঠে। জগতের সমস্ত প্রাণী

যখন কাঁদিতেছে তখন কবি তাঁর প্রিয়ার রূপ সেই অশ্রুজলে ধৌত করিয়া লইতে চান—নইলে তাঁর প্রাণ ভরে না।

তাই কবি তাঁর প্রিয়াকে বলিতেছেন—

সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে জলে
কাঁদিবারে শিখাই তোমায়,
পর দুঃখে ফেলিতে নিশ্বাস।
করুণার সৌন্দর্য্য অতুল
ও নয়নে করে যেন বাস।

যেখানে জীবের প্রতি করুণা নাই—সহানুভূতি নাই সেখানে কবি কোন সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পান না।

শোন বঁধু শোন, আমি করুণারে ভালবাসি,
সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি !

এইভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে জীবন এবং মরণের মাঝখানে বেশ একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে মৃত্যু ধ্বংসের রূপ মাত্র লইয়া কবির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, জীবনও তাই কবির নিকট একেবারেই দুঃখ এবং নৈরাশ্যময়।

ইহার পর প্রভাতসঙ্গীতের মধ্যে আমরা কবির এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখানুভূতি হইতে মুক্তির আভাস প্রথম লক্ষ্য করি। দারুণ দুঃখানুভূতি ও নৈরাশ্যের হাত হইতে কবির এই যে সহসা মুক্তি ইহা কবির খামখেয়াল মাত্র নয়। কেন না দেখা যায়, জীবনের সার্থকতার দিক, আশার দিক কবির চক্ষে সেই দিন ধরা দিল যেদিন

সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা নূতন তত্ত্ব তিনি জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবি জীবনটাকে দেখিয়াছিলেন তার ক্ষুদ্র স্থান এবং কালের গণ্ডির ভিতর দিয়া। তাই সেখানে তিনি জীবনের মধ্যে কোন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পান নাই।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক একটি দার্শনিক চিরদিন বাস করিয়া আসিয়াছে। তাই একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, কবির সকল বয়সের কবিতার মধ্যেই উপভোগের ধারার পাশাপাশি একটি চিন্তার ধারা বহিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে এই চিন্তার ধারা কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অনুভূতিতে পরিণত হইয়া যায়। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় একটি কবিতায় যাহা চিন্তার রূপ লইয়াছে, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অপর একটি কবিতায় তাহাই অনুভূতির রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার পর এই অনুভূতির ধারাটি কিছুদূর অবধি বহিয়া আসার পর আবার একটি নূতন চিন্তা এবং সমস্যা আসিয়া কবির চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে, এবং কাব্যের মধ্য দিয়া যতক্ষণ তাহার একটা সমাধান না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কবি সুস্থির হইতে পারেন না। সমাধানের পর দেখা যায় কবির এই পূর্ব্ববর্ত্তী চিন্তার ধারা আবার একটি নূতন অনুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে!

কবির দুঃখ সেইখানেই যেখানে তিনি জীবনের কোন বৃহত্তর পরিণতির সন্ধান খুঁজিয়া পাইতেছেন না।—কবির দুঃখ ঠিক এই জায়গাটিতেই।

প্রভাত সঙ্গীতের মধ্যে যে মুক্তির আস্বাদ আমরা প্রথম পাইলাম তাহা আকস্মিক একটা কিছু নয়। তাহার মধ্যে কবির নূতন চিন্তা-ধারার একটা স্পষ্ট আভাস বর্ত্তমান।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আরো অনেক কিছু, যাহা আমরা আদৌ লক্ষ্য করি নাই। এই যে কবির হৃদয় আনন্দে, উৎসাহে, বিশ্বাসে নাচিয়া উঠিল, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে কবির সৃষ্টি সম্বন্ধে নূতন অভিমত, নূতন ধারণা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির দুঃখবোধ যেমন ব্যক্তিগত বা স্থূল নয়, প্রভাত-সঙ্গীতের কবির আনন্দানুভূতিও তেমনি ব্যক্তিগত বা স্থূল নয়। সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির দুঃখের কারণ ছিল এই যে—দুনিয়ার সকল বস্তুই চলিয়া যায়—কিছুই চিরস্থায়ী নয়—

চলে গেল! আর কিছু নাহি বলিবার!
চলে গেল আর কিছু নাহি গাহিবার!

আর প্রভাতসঙ্গীতের কবির আনন্দের কারণ এই যে—কবি ইতি-মধ্যে জানিয়া ফেলিয়াছেন—

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবি মৃত্যুকেই জীবনের চরম পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; তাই জীবনের মধ্যে তিনি কোন আশ্বাস খুঁজিয়া

পান নাই। প্রভাতসঙ্গীতের কবি মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে শেষ হইতে দেন নাই, তাই জীবনের মধ্যে আশা ও আনন্দের সংবাদ তাঁহার নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতে মৃত্যু জীবন কাব্যের শেষ যবনিকা, আর প্রভাত-সঙ্গীতে মৃত্যু অনন্ত জীবননাট্যের মধ্যবর্ত্তী দৃশ্যান্তর মাত্র।

তাই সন্ধ্যাসঙ্গীতের মৃত্যু আনিয়া দেয় সমাপ্তির অবসাদ, আর প্রভাত-সঙ্গীতের মৃত্যু আনিয়া দেয় নব নব জীবনের নিত্য নব সম্ভাবনা।

তাই প্রভাতসঙ্গীতের কবির সবচেয়ে বড় আশ্বাস এই যে—

মরণ বাড়িবে যত কোথায় কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার;
উঠিবে জীবন মোর কত না আশায় চেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী,
যুগ যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি।

প্রভাত-সঙ্গীতের কবিকে জীবনের মধ্যে আশা ও আনন্দের সন্ধান পাইবার পূর্ব্বে মৃত্যুর সহিত রীতিমত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে হইয়াছে।

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।

এবং তাহার ফলে—

যা কিছু হারায় তাই নিয়ে মোর
প্রাণ করে হায় হায়।

এ সত্য রবীন্দ্রনাথের কবিতাবিশেষের মধ্যেই সার্থক হইয়া উঠে নাই, তাঁর কাব্যজীবনের ক্রমপরিণতির মধ্যেও ইহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের ভিতরকার অবসাদ এবং নৈরাশ্য অল্প লইয়া থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল। সেখানে কবি অল্প লইয়া থাকিতেন, তাই সেখানে 'মৃত্যু মৃত্যুর রূপ ধরিয়াছিল।'

প্রভাত-সঙ্গীতে আসিয়া কবি যেদিন বুঝিলেন—

নাই কিছু নাইরে ভাবনা
এ জগতে কিছুই মরে না!

যে দিন জানিলেন অতিবড় স্থূল পার্থিব ভালবাসারও মৃত্যু নাই—

নিমেষের মোহে জন্মে যে প্রেম উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন
সেও কভু জানে না মরণ।

সেদিন কবির মন সার্থকতার আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সেদিন সমস্ত জগত তাঁহার সম্মুখে আনন্দময় মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। আনন্দের আতিশয্যে কবি গাহিয়া উঠিলেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'
ধরায় আছে যত
মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর
হাসিছে গলা গলি

সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবি মানুষকে ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে করুণা এবং সহানুভূতির অংশ ছিল অত্যন্ত বেশি। সেখানে মানুষের জন্য কবির চক্ষে জল আসিত। কারণ সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির নিকট মানুষ ছিল মৃত্যুর খামখেয়ালি নিষ্ঠুর হস্তের অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। এহেন অসহায় অত্যাচারিত নিপীড়িত মানবের দিকে তাকাইয়া কবির আনন্দ হইত না, তাঁহার মন করুণা, দুঃখ এবং সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। কবি তাই তাঁর কল্পিত প্রিয়ার বাহিরের রূপে মুগ্ধ হইয়াও তাহার মধ্যে মানবের প্রতি করুণা এবং সহানুভূতির সন্ধান না পাইয়া বড় দুঃখে বলিতেছেন—

দিন দিন দেখিবারে পাই
যারে ভালবাসি প্রাণ মনে
সে করুণা তার মনে নাই !
পরের নয়ন জলে তার না হৃদয় গলে
দুখেরে সে করে উপহাস,
দুখেরে সে করে অবিশ্বাস ;
দেখিয়া হৃদয় মোর তরাসে শিহরি উঠে।

এই যে মানুষের জন্য কবির হৃদয়ের টান ইহা ভালবাসা নয়—ইহা অনুকম্পা, সহানুভূতি। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবির মানুষকে দেখিয়া আনন্দ হইত না—দুঃখ হইত। প্রভাত-সঙ্গীতের কবির মন কিন্তু মানুষকে দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে জগতের সমস্ত মানুষকে তিনি বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরেন। ইহা মানবের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ মাত্র নয়—ইহা মানবের জীবনের মধ্যে আনন্দ ও সার্থকতার পরিচয় পাওয়ায় কবির আনন্দোচ্ছ্বাস।

শুধু মানুষ নয়, সৃষ্টির প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই কবি আজ আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

সৃষ্টির এই সকল সৌন্দর্য্য যে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবির চক্ষে পড়ে নাই তাহা নয়, কিন্তু এ সকল সৌন্দর্য্য তিনি কোন দিন প্রাণ খুলিয়া উপভোগ করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া কবিচিত্ত ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিয়াছে! তাই সন্ধ্যা-সঙ্গীতের মধ্যে আমরা সন্ধ্যার অবসাদ ছাড়া আর কোন অনুভূতির সন্ধান পাই না।

প্রভাত-সঙ্গীতের কবি কিন্তু জানিয়া ফেলিয়াছেন মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের দিকে নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃসন্দেহে চাহিবার মত সাহস এবং উৎসাহ কবি-চিত্তে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

তাই আজ—

দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশু গুলি,
এসেছে ভাই বোন,
পুলকে ভরা মন,
ডাকিছে ভাই ভাই আঁখিতে আঁখি তুলি
শিশুরে লয়ে কোলে
জননী এল চলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে ঘুমো ঘুমো!
আনত দুনয়নে
চাহিয়া মুখ পানে
বাছার চাঁদ মুখে খেতেছে শত চুমো!

সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবি এ সকল দৃশ্য যে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই তাহা নয়, কিন্তু এ সকল দৃশ্য তিনি কোনদিন প্রাণ খুলিয়া ভোগ করিতে পারেন নাই। এই সকল দৃশ্য তাঁহার চিত্তে কেবল অনুকম্পা এবং করুণার সঞ্চার করিয়াছে মাত্র।

প্রভাত-সঙ্গীতের কবির কিন্তু আর কোন সঙ্কোচ, কোন দ্বিধা নাই.

তাই—

শিশুরে লয়ে কোলে
জননী এল চলে
বুকেতে চেপে ধরে
বলিছে ঘুমো ঘুমো !

ঠিক এই সকল সুন্দর দৃশ্যই সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিকে মনে করাইয়া দিত—

উৎসব ফুরায়ে গেলে
ছিন্ন শুষ্ক মালা
পড়ে থাকে হেথায় হোথায়
তৈল হীন শিখাহীন
ভগ্ন দীপ গুলি
ধূলায় লুটায়।

কবির চিত্ত অমনি ভয়ে শিহরিয়া চক্ষু বুজিয়া ফেলিত। তাঁহার মনে হইত, এই যে ভালবাসা, ইহার শেষ কোথায়? —এই যে মাতৃস্নেহ, এই যে শিশুর সুন্দর পবিত্র হাসি, এ সকল কদিনের জন্যই বা?—কেন না সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবি দেখিতেন—

তার পরে! তার পরে?
তার পরে বুঝি হেসেছিল!
হসিত কপোলে তারি এক ফোঁটা অশ্রুবারি
মুহূর্তেই শুকাইয়া গেল!
তার পরে? তার পরে
সব চলে গেল।

প্রভাত-সঙ্গীতের কবি কিন্তু আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, আমাদের এই সকল পার্থিব ভালবাসার মৃত্যু নাই। কেন না, কবি ইতিমধ্যে জানিতে পারিয়াছেন—

জগতের তলে তলে তিলে তিলে, পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন।

আজ তাই কবি প্রাণ খুলিয়া, ভরসা করিয়া জগতের পানে, সৃষ্টির পানে তাকাইতে পারিতেছেন। আজ সৃষ্টির কোন সৌন্দর্য্যের পানে তাকাইতে কবির দ্বিধা নাই—সঙ্কোচ নাই—সাহসের অভাব নাই। আজ পাখীর গান, প্রভাতের আলো, ফুলের সুবাস, সবই প্রাণ ভরিয়া নিঃসঙ্কোচে নিরঙ্কুশ ভাবে উপভোগ করিতে কবির এতটুকু দ্বিধা নাই। প্রাণ আজ খুলিয়া গিয়াছে। কবি তাই আজ সকলকেই ডাকিতেছেন—

ওঠ হে ওঠ রবি আমারে তুলে লও,
তরুণ তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও!
আয়রে আয় বায়ু যারে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত মাঝারেতে দেরে তা প্রসারিয়ে।

আকাশ এস এস
ভাবিছ বুঝি ভাই ?
গেছি ত তোরি বুকে
আমি ত হেথা নাই।

আজ কবির মনের মধ্যে সমস্ত উলোট পালট হইয়া গিয়াছে। কবি আজ আর 'অল্প লইয়া' বাস করেন না, তাই, 'যাহা যায় তাহা লইয়া' তাঁহার চিত্ত আর হাহাকার করিয়া উঠে না।

জীবনকে উপভোগ করিবার পূর্ব্বে কবিকে মৃত্যুর সহিত রীতিমত বোঝাপাড়া করিয়া লইতে হইয়াছে। মৃত্যুর জটিল সমস্যা সমাধান করিয়া কবি তবে জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে সাহসী হইয়াছেন. জীবনের সুখ-সৌন্দর্য্যকে স্বীকার করিয়া লইবার পূর্ব্বে কবিকে মৃত্যুর সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছে।

তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—

জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ ত নহে তোর পর !
আয় তারে আলিঙ্গন কর,
. আয় তার হাত খানি ধর !

এখন পর্য্যন্ত তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইলাম, প্রভাত-সঙ্গীতের কবি মৃত্যুর সহিত একটা রফা করিয়া লইতে পারিয়াছেন এবং তাহার ফলে মৃত্যুর পরও যে জীবনের জের চলিতে থাকে তাহাও স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং এখন আর জগতটাকে উপভোগ করিতে তাঁহার

চিত্ত এতটুকু বাধা প্রাপ্ত হয় না। কবির মৃত্যুভয়ভারাক্রান্ত চিত্ত সহসা আজ হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে।

কবি এখন আর গভীর কিছু চান্ না। এখন তিনি সৃষ্টিকে হাল্কা ভাবে উপর হইতে ভোগ করিতে চান; তাই প্রভাত-সঙ্গীতের পরই আমরা পাই কবির 'ছবি ও গান।'

এই কাব্যগ্রন্থখানির মধ্যে কবি কেবল চোখ দিয়া জগতের সৌন্দর্য্য পান করিয়া গিয়াছেন। কোথাও এতটুকু চিন্তাশীল হইবার চেষ্টা করেন নাই।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবি সীমাবদ্ধতার যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রভাত-সঙ্গীতে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে এই সীমাবদ্ধতার শৃঙ্খল অপসারিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাও খুব সহজে নয়। তাহার জন্য কবিকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াইতে হইয়াছে। ইহার পর কবি বিশ্রাম চান। এই কষ্টসাধ্য মুক্তির পর কবি দিনকতক দুনিয়াকে নিরুদ্বেগে ভোগ করিয়া লইতে চান্।—একেবারে হাল্কা ভাবে ভোগ করিতে। আল্‌গা ভাবে চোখ দুটাকে চারিদিকে মেলিয়া দিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চান। 'ছবি ও গানের' মধ্যে ইহারই লক্ষণ আমরা পাই।

কবি এখন প্রকাণ্ড একটা সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়া খানিকটা শান্তি ভোগ করিয়া লইতে চান।

'ছবি ও গানের' কবি নিরুদ্বেগ চিত্তে বসিয়া বসিয়া সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া লইতে চান। তিনি কখনও বা অলস মধ্যাহ্নে দেখিতেছেন—

ঝিকি মিকি বেলা;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।

কখনও বা সন্ধ্যাকালে দেখিতেছেন—

একটি মেয়ে একেলা,
সাঁঝের বেলা
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারি দিকে সোনার ধান ফলেছে।

কখনও বা প্রভাতে অলস ভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন—

নীল আকাশেতে নারিকেল তরু,
ধীরে ধীরে তার পাতা নড়ে,
প্রভাত আলোতে কুড়ে ঘর গুলি,
জলে ঢেউ গুলি উঠে পড়ে।
দুয়ারে বসিয়া তপন কিরণে
ছেলেরা মিলিয়া করে খেলা।

কখনও বা দেখিতেছেন, একটা পাগল আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে,
কেউ শোনে কেউ শোনে না।
ঘুরে বেড়ায় জগৎ পানে চেয়ে
কেউ দেখে কেউ দেখে না।

আবার পরক্ষণেই একটি মাতালের প্রতি কবির দৃষ্টি পড়িয়া গেল কবির সবই ভাল লাগে। কবির কাছে আজ সবই অপূর্ব্ব, সবই চমৎকার। মাতালকে দেখিয়া কবির মনে হয়—

চাঁদের কিরণ পান করে ওর
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,
কাছে ওর যেওনা,
কথাটি শুধায়োনা,
ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে
বসে আছে একাকী
ঘুমের মত মেয়েগুলি
চোখের কাছে দুলি দুলি
বেড়ায় শুধু নূপুর রণ রণি।
আধেক মুদি আঁখির পাতা
কার সাথে সে কচ্ছে কথা,
শুনছে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি।

কখন বা একটা ভাঙ্গাবাড়ী কবির চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে—

চারিদিকে কেহ নাই একা ভাঙ্গা বাড়ি
সন্ধ্যা বেলা ছাদে বসে ডাকিতেছে কাক,
নিবিড় আঁধার মুখ বাড়ায়ে রয়েছে,
যেথা আছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাঁক।

আবার কখনও দেখিতেছেন—

সে যে জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে—
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।

এমনি করিয়া কবি নিশ্চিন্ত মনে কেবল ছবির পর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন।

প্রভাত-সঙ্গীতে কবি এমন এক গুপ্ত মহাদেশের সন্ধান পাইয়াছেন সেখানে জগতের সমস্ত হারাণ জিনিষ গিয়া জমা হইতেছে এবং সেই সান্ত্বনা বুকে করিয়াই কবি 'ছবি ও গানের' মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে সৃষ্টিটাকে উপভোগ করিয়া চলিতেছিলেন। মনে করিয়াছিলেন বুঝি বা আর কখনও কোন সন্দেহ, কোন সমস্যা মনের মধ্যে উদিত হইবে না।

এই নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দ কবিকে কিছুদিনের জন্য এমনই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে কবি কিছুদিনের জন্য সৃষ্টির কোথাও কোন বাধা বা দুঃখের লেশমাত্র খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু এমন ভাবে কদিন চলে ?

কবি মনে করিয়াছিলেন, মৃত্যুর সহিত একটা বোঝাপড়া হইয়া গেলেই বুঝি তাঁহার জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, সমস্ত অভাব অভিযোগের অবসান হইবে। কিন্তু তাহা হয় না, অন্ততঃ এত সহজে হয় না।

কবি বুঝিলেন, যতই তিনি জীবনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করুন না কেন, জীবন তার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ রূপ পরিত্যাগ করিয়া সকল সময় পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। মৃত্যুর পরও যে জীবনের ধারা অব্যাহত থাকে একথা জানিবার পর আমরা বর্ত্তমান জীবনকে নিষ্ফল বলিয়া আর সন্দেহ করি না বটে, কিন্তু বর্ত্তমান জীবন যখন মৃত্যুর মধ্যে আপনার ছোটো খাটো সুখ-দুঃখকে বিসর্জ্জন দিয়া চোখের সুমুখে নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে তখন তাহার জন্য কার না বুক ফাটিয়া কান্না আসে ?—সূর্য্য যখন অস্তে যায় তখন কে না জানে যে পরদিন আবার সে উঠিবে, তবুও সন্ধ্যার অবসাদ আমাদের মনকে ব্যথাতুর করিয়া তুলে। তেমনি মৃত্যুর পরও জীবনের ধারা সমানভাবে

প্রবাহিত হইতে থাকিবে একথা জানিয়াও আমাদের মন তাহার জন্য ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়া উঠে।

এ দুইটিই আমাদের পক্ষে সত্য। মানুষ মরে না, সে অনন্ত-জীবন পথের যাত্রী, সুতরাং তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিবার কিছুই নাই— এ কথাও যেমন সত্য, মানুষ চলিয়া যাইতেছে, মৃত্যু আসিয়া তাকে আমাদের কাছ হইতে কোথায় সরাইয়া লইয়া যাইতেছে, কাল আর তাহাকে দেখিতে পাইব না, একথাও ঠিক তেমনিই সত্য, যুক্তির দিক দিয়া না হইলেও, অনুভূতির দিক দিয়া, রসের দিক দিয়া সত্য।

তাই 'ছবি ও গানের' একটি কবিতায় কবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—-

জীবনের পিছে মরণ দাড়ায়ে
আশার পশ্চাতে ভয়,
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়।

জীবনের শেষ পরিণতি যাহাই হউক না কেন, এই পরিণতির পথে আমাদিগকে যে পদে পদে অনেক দুঃখ, অনেক নৈরাশ্য, অনেক ব্যথা সহ্য করিতে হয়, একথা কে অস্বীকার করিবে ?

তাই 'ছবি ও গানের' পর 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে আসিয়া কবি জীবনের এই দুইটি সত্যকে একই সঙ্গে পাশাপাশি দেখিতে পাইলেন।

'ছবি ও গানের' পূর্ব্বে কবি ঠিক সৃষ্টির পানে চোখ মেলিয়া কোনদিন তাকান নাই। সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে যে তাকান নাই তাহার কারণ, তখন পর্য্যন্ত কবি সৃষ্টিকে খামখেয়ালী একটা ব্যাপার বলিয়া

মনে করিতেন, আর 'প্রভাত-সঙ্গীতের' মধ্যে যে কবি প্রকৃতির পানে তাকান নাই, তাহার কারণ, কবি তখনও পর্য্যন্ত ঠিক প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। দুঃখ সমস্যা সমাধানের সাফল্য তাঁহাকে এমনি পাইয়া বসিয়াছিল যে তার এত দিনকার রুদ্ধ আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্য প্রকৃতির সাহায্য লইবার মত ধৈর্য্য এবং অবকাশ তাঁহার ছিল না। তিনি সেখানে নিজের মনের আনন্দে নাচিয়া কুঁদিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, সন্ধ্যাসঙ্গীতের দুঃখও যেমন সম্পূর্ণ মানসিক, প্রভাতসঙ্গীতের আনন্দও ঠিক তেমনিই মানসিক। উভয় ক্ষেত্রেই কবি নিজের মনগড়া সুখ দুঃখ লইয়া মাতিয়া রহিয়াছেন।

'ছবি ও গানের' মধ্যে আমরা কবিকে প্রথম প্রকৃতিস্থ অবস্থায় পাই। কবিকে এই প্রথম আমরা বহিঃপ্রকৃতির পানে চোখ মেলিয়া চাইতে দেখি।

জীবনের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া কবি প্রথম প্রথম সমস্তই আনন্দময় দেখিতে লাগিলেন। তখনও কবির ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে আসিয়া কবি ঠিক বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব-জীবনের পানে সম্পূর্ণ সজাগ ভাবে চাহিয়া দেখিলেন। তখন জীবনকে তিনি চিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগের আগার বলিয়া যেমন ধরিয়া লইলেন না, নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের স্থান বলিয়াও তেমনি স্বীকার করিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করিলেন।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাত-সঙ্গীতের' মধ্যে যে দুইটি ভিন্ন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদের মূলে যে পার্থক্য সে পার্থক্য জীবনে নয়—যুক্তিতে মাত্র। আসল কথা, সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে কবির যে অন্তর্নিহিত ব্যথা লুকাইয়াছিল তাহার বিপক্ষে 'প্রভাত-সঙ্গীত' যতই

মাতামাতি করুক না কেন, কবির জীবন হইতে তাহাকে মুছিয়া ফেলিতে সে কোনদিনই সক্ষম হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ প্রভাত-সঙ্গীতের মধ্যে দুঃখকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে আসিয়া জীবনের পানে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া কবি বুঝিলেন, দুঃখ অস্বীকার করিবার জিনিষ নয়, তাহাকে স্বীকার করিয়া না লইলে জীবনের অনেক সত্যকেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করিতে হয়।

আর একটা জিনিষ এই সঙ্গে লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্ত্তী জীবনে দুঃখকে শুধু যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা নয়, দুঃখকে তিনি জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কেন না এই দুঃখবোধই তাহাকে পরিপূর্ণতর সত্তার পানে একটু একটু করিয়া আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। একথা শুধু তাঁর কবিতাবিশেষের মধ্য দিয়াই শুধু আত্মপ্রকাশ করে নাই—তাঁর কাব্য-জীবনের ক্রম পরিণতির মূলেও এই সত্যের সন্ধান আমরা পদে পদে পাইয়াছি। সন্ধ্যাসঙ্গীতের তীব্র দুঃখবোধই একদিন কবিকে পরিপূর্ণতর জীবনের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের—

চলে গেল, সকলেই চলে গেল গো!
বুক শুধু ভেঙ্গে গেল, দলে গেল গো।

এই দারুণ দুঃখবোধই একদিন কবির মনে সান্ত্বনা আনিয়া দিল—

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না!

এমনি করিয়া দুঃখকে বার বার স্বীকার করিয়া লইয়া কবি তাহার ভিতর হইতে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন। তাই দুঃখকে কবি কোনদিন দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চান নাই। তাই 'প্রভাত-সঙ্গীতের' পর 'ছবি ও গানের' মধ্যে কয়েকদিন মাত্র সুখের গান গাহিয়াই কবির স্বাভাবিক দুঃখবোধ আবার জাগিয়া উঠিল তাই 'কড়ি ও কোমলে' আসিয়া কবি আবার সেই পুরাতন দুঃখানুভূতিকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন এবার দেখা যাক্, এই দুঃখ-সমুদ্র মন্থন করিয়া কবি আবার কোন্ নূতন অমৃতের সন্ধান পান

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'কড়ি ও কোমলে' আসিয়া কবি প্রথম জীবনের সহিত ঠিক ভাবে পরিচিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে 'ছবি ও গানে কবি বহিঃপ্রকৃতির পানে তাকাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু একবারে উপর হইতে, ভাসা ভাসা ভাবে। 'কড়ি ও কোমলে' আসিয়া কবি প্রথম মানব-জীবনের সহিত পরিচিত হইলেন।

শুধু প্রকৃতির পানে তাকাইয়া দুঃখকে লক্ষ্য না করিয়াও মানুষ চলিতে পারে, কিন্তু মানুষের দিকে চাহিয়া ওরূপ করা চলে না তাই 'ছবি ও গানের' মধ্যে দুঃখবোধের লেশমাত্র নাই, কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে' আসিয়া কবিকে দুঃখবোধের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু একটি জিনিষ এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, সন্ধ্যা-সঙ্গীতের দুঃখবোধকে তাড়াইতে গিয়া কবি তার 'প্রভাত সঙ্গীতের' মধ্যে মৃত্যু এবং জীবনের যে নূতন রূপ আবিষ্কার করিলেন, তাহাতে করিয়া সন্ধ্যাসঙ্গীতের দুঃখবোধ ত' নষ্ট হইলই না—উপরন্তু তাহার সহিত প্রভাতসঙ্গীতের অনন্ত জীবনের নূতন ধারণাও কবির মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

এখন হইতে কবির মধ্যে দুইটি ধারা পাশাপাশি চলিতে আরম্ভ

করিয়াছে,—একটি দুঃখবোধের ধারা, আর একটি পরিপূর্ণতর জীবনের জন্য কবিচিত্তের ব্যাকুলতার ধারা।

এমনি করিয়া অভাববোধ এবং তাহা হইতে পরিপূর্ণতর হইয়া উঠিবার বাসনা কেমন করিয়া ভবিষ্যতে কবিকে একটু একটু করিয়া এক বিরাটতর সত্তার দিকে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছে কবির শেষ জীবনের কাব্যগুলি তাহারি সন্ধান বলিয়া দেয়। এখনও সে কথা বুঝাইবার সময় আসে নাই। পরে যথাস্থানে সে কথার আলোচনা করিব। এখন 'ছবি ও গানের' পালা শেষ করিয়া 'কড়ি ও কোমলে' আসিয়া পড়া যাক্।

এইমাত্র বলিলাম, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' দুঃখবোধ এবং প্রভাতসঙ্গীতের অনন্ত-জীবনের ধারণা এই দুটি জিনিষ রবীন্দ্রনাথের রস-জীবনের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। 'কড়ি ও কোমলে' এই সংমিশ্রণের সামান্য আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু 'মানসীর' পর হইতে ইহা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'চিত্রার' মধ্যে কবি নিজেই এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহারি ফলে তাঁর 'জীবন-দেবতার' সৃষ্টি।

'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে একদিকে সন্ধ্যাসঙ্গীতের দুঃখবোধ, এবং সীমাবদ্ধতার ক্ষুব্ধতা যেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি প্রভাতসঙ্গীতের অনন্ত-জীবনের আশ্বাসও যে কম পাওয়া যায় তাহা নয়।

'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' সীমাবদ্ধতার দুঃখকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য কবি 'প্রভাত-সঙ্গীতে' অনন্ত-জীবন আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতে করিয়া ফল হইল এই যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' দুঃখ এবং 'প্রভাত-সঙ্গীতের' আশ্বাস দুই-ই কবির মধ্যে একই সঙ্গে আশ্রয় লইল। এ দুইটিই যে সত্য। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি যে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে

পারে না। তাই 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে আমরা এই দুইটি সত্যেরই সন্ধান পাই।

'কড়ি ও কোমলের' প্রথম দিকের অধিকাংশ কবিতাই 'চলে যাওয়ার' সুরে ব্যথাতুর। মৃত্যুর বিষাদ ছায়া এই কাব্যগ্রন্থখানির অনেকগুলি কবিতাকেই করুণ এবং অশ্রুসজল করিয়া তুলিয়াছে। কবি একদিকে যেমন বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি আশু বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তাঁর দরদী চিত্ত অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাই প্রস্ফুটিত চম্পকপুষ্পের অতুল সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি বড় দুঃখে বলিতেছেন—

ও যেদিন ফুটেছিল নব রবি উঠেছিল  
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত অনিলে।  
ওই যে শুকায় চাঁপা পড়ে একাকিনী,  
তোমরা তো জানিবে না উহার কাহিনী।  
কবে কোন সন্ধ্যাবেলা ওরে তুলেছিল বালা,  
ওরি মাঝে বাজে কোন পূরবী রাগিণী।

এ সেই সন্ধ্যাসঙ্গীতের সুর। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, ইহার মধ্যে একটু তফাত আছে। তফাতটা এই যে, সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবি প্রকৃতি এবং মানবজীবনের পানে না তাকাইয়াই দুঃখ করিয়াছেন। তাই তাঁহার সে দুঃখ একেবারেই দার্শনিক দুঃখ। তাই তাঁর সে দুঃখের মূলে কোন স্থান-কাল-পাত্রের সন্ধান পাওয়া যাইত না।

প্রভাত-সঙ্গীতের পর হইতে কবি প্রকৃতি এবং মানবজীবনের পানে তাকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে, এক দিক হইতে কবি যেমন পার্থিব পদার্থের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, অপর দিক হইতে তেমনি

এই সকল ক্ষণস্থায়ী পার্থিব পদার্থের সৌন্দর্য্য কবির রসদৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

কবিতাটি এই পর্য্যন্ত সন্ধ্যাসঙ্গীতের সুর অনেকটা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তার পরই আমরা প্রভাত-সঙ্গীতের সেই অনন্তজীবনের আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই।

তাই—

একটু কুসুম কণা তাও নিতে পারিল না,
ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার।

এই কথা বলিবার পরই কবি কবিতাটি শেষ করিতেছেন এই বলিয়া যে—

মিছে শোক মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগযুগান্তর।

এই সঙ্গে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। কবি নারীর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনেকগুলি কবিতা 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে লিখিয়াছেন। এইগুলির ভিতর দিয়া দেখা যায়, কবি এক দিক হইতে যেমন নারীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন, অপর দিক হইতে তেমনি ইহাতে তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ইহার ক্ষণস্থায়িত্ব কবিচিত্তকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে;—ইহা অপেক্ষা স্থায়ী এবং পরিপূর্ণতর সৌন্দর্য্যের জন্য কবির চিত্ত উতলা হইয়া উঠিয়াছে।

তাই কবি যখন বলিয়া উঠিলেন—

ওই দেহখানি তব আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।

*　　*　　*　　*　　*　　*

ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়িয়া গেল, ক্ষণস্থায়ী এই দেহের জন্যই কি এত ব্যাকুলতা? পরক্ষণেই কবি বলিতেছেন, না তাহা নয়—শুধু দেহের জন্য এ ব্যাকুলতা নয়,—ইহার পশ্চাতে আরও অনেক কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারান সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।

কিন্তু ইহাতেও কবি সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত এবং নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে বলিতে হইল—প্রেমের পূর্ণতা কোনদিন পার্থিব ক্ষণস্থায়ী নারীর মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না—এমন কি সে নারী যদি লক্ষ জন্মের স্মৃতি বহিয়া আনে তাহা হইলেও না।

তাই কবি বড় দুঃখে বলিতেছেন—

নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন;
লও লও বেঁধে লও, কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লও চুরি করে,
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।

জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্ত-কালের মোর জীবন মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোকে লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত, বাসমুক্ত দুটি নগ্নপ্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।

এই অবধি আসিয়াই কবি হতাশ হইয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন—

একি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্ খানে ?

'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে কবি যেখানেই সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন সেইখানেই তাহার সহিত আরও অনেক কিছু জুড়িয়া দিয়া তবে আশ্বস্ত হইয়াছেন।

তিনি ক্ষুদ্রের মধ্যে যেখানেই সুন্দরের আভাস পাইয়াছেন সেইখানেই তাহাকে বৃহত্তরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তা না হইলে ক্ষণস্থায়িত্বের বেদনা তাঁর চিত্তকে ভিতরে ভিতরে পীড়া দেয়। "নাল্পে সুখমস্তি"—অল্পে যে সুখ নাই—বিচ্ছিন্ন এবং সীমাবদ্ধ কোন পদার্থে যে সৌন্দর্য্য নাই—এ কথা কবি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন।

তাই যেখানে তিনি ক্ষুদ্রকে বৃহত্তম সত্তার সহিত যুক্ত করিতে পারেন নাই, সেখানে অন্ততঃ তাহাকে তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর সত্তার সহিত যুক্ত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন।

তাই একটি সামান্য পাখীর পালক দেখিয়াও কবি বলিয়া উঠিলেন—উহা যে এত সুন্দর তার কারণ, এই পাখীর পালকটির মধ্যে আরও অনেক

কিছু আছে ;—ইহার মধ্যে নীল আকাশের কথা আছে, কত ছোটখাটো নীড়ের কাকলিস্বর উহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

নয়ন ঢুলানো কোমল পরশ
ঘুমের পরশ যথা,
মাথা যেন তায় মেঘের কাহিনী—
নীল আকাশের কথা।
ছোটখাটো নীড়, শাবকের ভীড়,
কত মত্ত কলরব ;
প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা
মনে পড়ে যেন সব।
—কড়ি ও কোমল।

'কড়ি ও কোমলের' অনেক কবিতার মধ্যেই কবির রূপমুগ্ধতার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাঁর এই পার্থিব-রূপমুগ্ধতা সম্বন্ধে অনেক কথা কবি তাঁর একটি কবিতায় পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই যে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব-সৌন্দর্য্য তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ করিতেছে, ইহার পশ্চাতে অনন্ত-সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত বর্ত্তমান, এবং তাই তাঁর চিত্ত এই সকল পার্থিব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়।

কবি বলিতেছেন—

অনন্ত দিবস রাত্রি কালের উচ্ছ্বাস
তারি মাঝখানে শুধু একটি নিমেষ,
একটি মধুর সন্ধ্যা, একটু বাতাস
মৃদু আলো আঁধারের মিলন আবেশ—

তারি মাঝখানে শুধু একটুকু জুঁই,
একটুকু হাসিমাখা সৌরভের লেশ—
একটু অধর তার ছুঁই কিনা ছুঁই—
আপন আনন্দ লয়ে উঠিতেছে ফুটে,
আপন আনন্দ লয়ে পড়িতেছে টুটে,
সমগ্র অনন্ত ঐ নিমেষের মাঝে
একটি বনের মাঝে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।
যেমনি পুলক টুটে ফুল ঝরে যায়
অনন্ত আপনা মাঝে আপনি মিলায়।

ইহার পর কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন, আমাদের এই যে দুঃখ, এই যে হাহাকার, ইহার মূলে রহিয়াছে আমাদের সীমাবদ্ধতার সঙ্কীর্ণতা।

বুঝেছি বুঝেছি সখা কেন হাহাকার।
আপনার পরে মোর কেন সদা রোষ।
বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার,
আমি আছি তুমি নাই তাই অসন্তোষ।
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি—
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণ বাহু আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমারে হায় অস্থি চর্ম্মসার।
কোথা নাথ কোথা তব সুন্দর বদন,
কোথায় তোমার নাথ বিশ্বঘেরা হাসি।
আমারে কাড়িয়া লও, করগো গোপন,
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এই সকলের মূলে রহিয়াছে কবির সন্ধ্যাসঙ্গীতের সেই আদিম দুঃখবোধ। এই দুঃখবোধ কেমন করিয়া কবিকে একটু একটু করিয়া অনন্তের আভাস দিয়াছে তাহা বোধ হয় এতক্ষণে অনেকটা আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' পর 'প্রভাতসঙ্গীত' এবং তারপর 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমলের' ভিতর দিয়া কবির সেই সীমাবদ্ধতার দুঃখ, সেই 'শেষ হইয়া যাওয়া'—'ফুরাইয়া যাওয়ার' দুঃখ কেমন করিয়া কবিকে একটু একটু করিয়া অমৃতের সন্ধান দিতেছে এবং কেমন করিয়া কবিকে একটু একটু করিয়া অনন্তের পানে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষুদ্র ইতিহাসের সহিত আমরা বোধ হয় কতকটা পরিচিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছি।

দুঃখকে মায়া বলিয়া অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দিয়া কবি কোনদিন তৃপ্তি পান নাই। তিনি গোড়া হইতেই দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং এই দুঃখবোধই তাঁহাকে একটু একটু করিয়া আনন্দসন্ধানী করিয়া তুলিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'কড়ি ও কোমলের' শেষের দিকে কবি নারী সম্বন্ধে অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে এই সকল কবিতার মধ্যে কবি নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যকে বিশেষ মূল্য দেন নাই। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য যে তাঁহাকে মুগ্ধ করে নাই তাহা নয়, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যবোধ তাঁহাকে নারীর দেহের সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। নারীর ক্ষণস্থায়ী দৈহিক সৌন্দর্য্য তাঁর চিত্তকে পূর্ণতর সৌন্দর্য্যের জন্য আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

'কড়ি ও কোমলের' এই সকল কবিতা কবির ভরাযৌবনের রচনা। এ যখনকার কথা বলিতেছি তখন কবির বয়স চব্বিশ কি পচিশ। সে সময় কবির নিকট সমস্ত জগত প্রেমের আবেশে স্বপ্নময়। এ সময়

স্বভাবতঃ সৃষ্টির উৎসবের দিকটাই আমাদের চোখে পড়ে। কবির কিন্তু অনেক সময়ই তাহা পড়ে নাই। এক দিকে তিনি যেমন প্রেমের গান গাহিয়াছেন অপর দিকে তেমনি মরণশীল মানবের ক্ষণস্থায়ীত্বের ব্যথা তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়া দিয়াছে তাই 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে প্রেমের কবিতার পাশাপাশি শোকের কবিতা এত প্রচুর স্থান পাইয়াছে তাই প্রিয়জনের বিয়োগে কবিকে বারবার কাঁদিতে দেখা গিয়াছে।

দেখ ওই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করেছে আকুল ;
পুরাণ সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
কত স্নেহ ভাবে
হায়, কোথা যাবে !

তাই মা-ধরণীর দিকে চাহিয়া কবিকে বড় দুঃখে বলিতে হইয়াছে—

হে ধরণী, জীবের জননী
শুনেছি যে মা তোমায় বলে,
তবে কেন সবে তোর কোলে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চলে।

আসল কথা যৌবনের স্বপ্নঘোর কবিকে পাইয়া বসিলেও যৌবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং বিশেষ করিয়া মানবজীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা কবি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। তাঁর চিরঅতৃপ্ত মন সীমার মধ্যে পরিপূর্ণ আনন্দের সন্ধান পাইতেছে না। তাই 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে কবি যেমন একদিকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে গেছে
বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর
পরশের মতো।

অন্যদিকে তেমনি আবার তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—

এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়।
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়;
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চেনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখীতে।
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বন তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর।
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলক ভরে, যৌবন কাতর।
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চির পিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণ-পরিপূর্ণ মরণ অনল,
মনে পড়ে, হাসি আসে? চোখে আসে জল?

'কড়ি ও কোমলের' মধ্যে কবি অনেকগুলি বিদেশী কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন। কবি এই গুলিকে একস্থানে পাশাপাশি পর পর সাজাইয়া ইহাদের নাম দিয়াছেন 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ'। এই অনুবাদ-কবিতাগুলির

দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায়, এগুলি সমস্তই প্রায় শোকের কবিতা, দু-একটি আবার একেবারেই প্রিয়জনের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। যেমন—

বেঁচেছিল, হেসে হেসে
খেলা করে বেড়াত সে,
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কী হ'ল তোমার।

—ভিক্তর হ্যুগো।

আসল কথা 'কড়ি ও কোমলের' কবি সৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কথা ভুলিতে পারেন নাই।

'মানসী'তেও কবি অনেকগুলি প্রেমের কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন. এখনও কবির প্রেমের কবিতা লেখার যুগ চলিতেছে। কিন্তু এখানেও আমরা দেখিতে পাই, কবি 'অল্পে' সুখী হইতে পারেন নাই,—তিনি ক্রমাগত আক্ষেপ করিতেছেন,—পার্থিব সৌন্দর্য্য দুদিনেই পুরাতন হইয়া যায়। আজ যাহা ভাল লাগে কাল তাহাতে আর মন তৃপ্ত হয় না। যাহাকে পাইলে জীবন সার্থক হইবে বলিয়া মনে হয়, পাইবার পর দেখা যায় বেশিদিন সে স্বপ্ন-মোহ থাকে না। কিছুদিন পরেই নূতনত্ব চলিয়া যায়, তখন কাঁদিয়া বলিতে হয়—

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে ?
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।

তাঁর কল্পিত প্রিয়াকে কবি কোন দিন খুব নিকটে আনিতে সাহস পান নাই। তাঁর সর্ব্বদা ভয়, পাছে তাঁর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

দূর হইতে যখন আমরা কোন জিনিষকে দেখি, তখন তাহাকে ছোট করিয়া দেখি না, সীমাবদ্ধ করিয়া দেখি না,—আমাদের 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দেখি, তাই তাহা ছোট হইয়া, সীমাবদ্ধ হইয়া, 'অল্প' হইয়া আমাদের নিকট আসিতে পারে না। কবি তাই সকল জিনিষকে তফাত হইতে দেখিতে চান। তফাত হইতে দেখার মধ্যে সুবিধা এই যে, দূরত্বের এই যে ব্যবধান, ইহাকে তিনি নিজের মনের পরিপূর্ণতা দিয়া ভরাইয়া তুলিতে পারেন, সুতরাং জিনিষটি তাহার নিজস্ব সীমাবদ্ধ রূপ লইয়া আসিতে পারে না। এখানেও সেই সীমাবদ্ধতার দুঃখ কবিকে ভিতরে ভিতরে পীড়া দিতেছে।. কবি তাই বড় দুঃখে বলিতেছেন—

> নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া !
> কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
> দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।

এখনও সেই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' দ্বন্দ্ব থামে নাই। এখনও সেই অসম্পূর্ণতার বেদনা কবিকে ভিতরে ভিতরে পীড়া দিতেছে। এখনও তাই সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য কবিকে পূর্ণভাবে মুগ্ধ করিতে পারিতেছে না,—কোথায় যেন ক্ষুণ্ণতা থাকিয়া যাইতেছে।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এ পর্য্যন্ত আমরা কবির নিকট হইতে প্রথমশ্রেণীর নিসর্গ-কবিতা একটিও পাই নাই। তাহার কারণ কবি এখন পর্য্যন্ত বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে খুব বেশী আস্থাবান হইতে পারেন নাই। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব চলিতেছে—সন্ধ্যাসঙ্গীতের সেই পুরাতন সমস্যা—'সৃষ্টিটা কি বিধাতার একটা খামখেয়াল মাত্র ?'—এখনও এ দ্বন্দ্বের ঠিক সমাধান হয় নাই।

তাই সৃষ্টির প্রতি কবির খুব বেশি শ্রদ্ধা নাই। তাই কবিকে বলিতে হইয়াছে, এ পৃথিবীর মধ্যে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। পার্থিব কোন কিছুর উপর মানুষ নির্ভর করিতে পারে না।

তাই আজ বার বার ধাই তব পানে,
কোথা তুমি নিখিল নির্ভর!

এমনি করিয়া পৃথিবীর মধ্যে কবি যতই চিরস্থায়ী কোন কিছুর সন্ধান পাইতেছেন না, ততই তাঁর মন সৃষ্টির বাহিরের আর একটি সত্তার দিকে ধাবিত হইতেছে। এমনি কয়িয়া দুঃখের ভিতর হইতে আনন্দের সন্ধান অল্পে অল্পে কেমন করিয়া কবি পাইতেছেন তাহা সত্যই লক্ষ্য করিবার জিনিষ। পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ কবির নিকট যতই ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মনে হইতেছে, পৃথিবীর বাহিরের আর একটি চিরস্থায়ী সত্তার জন্য কবির চিত্ত ততই লালায়িত হইয়া উঠিতেছে।

এখনও কবি জানিতে পারেন নাই, এই যে ক্ষণস্থায়ী জীবন, এই যে দুদিনের পৃথিবী, এই যে সীমাবদ্ধ সৃষ্টি ইহার মধ্যেই সেই সীমাতীতের সন্ধান পাওয়া যায়। এখনও কবির মধ্যে কোথায় একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে সৃষ্টিকে ভুলিয়া, সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া, সৃষ্টির মোহ কাটাইয়া তবে বুঝি সেই সীমাতীতের সন্ধান মিলিবে, সৃষ্টি বুঝি এই অসীমের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

সৃষ্টির প্রতি এখন পর্য্যন্ত কবির এতই অবিশ্বাস যে তাঁর সময় সময় মনে হয়, বাস্তব পৃথিবীর সত্যগুলি যদি স্বপ্নের মত মিথ্যা হইত এবং মানুষের মনের কল্পনা এবং স্বপ্নগুলি যদি সত্য হইত তাহা হইলে হয়ত মানুষ সুখী হইতে পারিত

স্বপ্ন যদি হত জাগরণ,
সত্য যদি হ'ত কল্পনা,

তবে এ ভালবাসা হ'ত না হত আশা
কেবল কবিতার জল্পনা।
মেঘের খেলা সম হত সব
মধুর মায়া ময় ছায়া ময়।
কেবল আনা-গোনা নীরবে জানা শোনা
জগতে কিছু আর কিছু নয়।

কবি আর এক স্থানে তাঁর মানসী-প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—মনে হয় তোমার সমগ্র সত্তাকে আমি নিমেষে নিজের মধ্যে টানিয়া লই—

প্রাণ মন লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধা-স্রোতে
তোমার বদন ব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব
তাই এ ক্রন্দন।

কিন্তু পরক্ষণেই কবিকে বলিতে হইয়াছে—

বৃথা এ ক্রন্দন!
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভাল,

হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টি টুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস্‌!
একি দুঃসাহস!

এখানেও সেই সৃষ্টির ক্ষণস্থায়িত্ব এবং মানুষের সীমাবদ্ধতার দুঃখই কবিকে পীড়া দিতেছে। এখানে কিছুই পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না, এখানে কিছুই নিবিড়ভাবে, শাশ্বত ভাবে পাওয়া যায় না।

তাই কবি বিশ্বকে বাদ দিয়া বিশ্বাতীতের সন্ধান করিতে চান। তাই কবি বলিতেছেন—

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি।
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি।

এই 'বিশ্ববিহীন বিজন' কথাটি কবির মনের অনেক গোপন কথা বলিয়া দেয়।

কবি যেন সংসারের কোন কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, দুনিয়ার কোন কিছুরই উপর নির্ভর করিতে পারিতেছেন না।

তাই কবি গাহিতেছেন—

এই সঙ্কটময় কর্ম্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা,
দূরে মায়াময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।

তাঁর মনে হইতেছে—এ জীবনে কোন কিছুই সম্পূর্ণ হয় না ; সবই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে
হোলো না, কিছুই হোলো না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
রবে না।
শেষে দেখিব, পড়িল সুখ যৌবন
ফুলের মতন খসিয়া ;
হায় বসন্ত বায়ু মিছে চলে গেল
শ্বসিয়া।

তার পরই সংসার-বিরাগী কবিচিত্ত গাহিয়া উঠিল—

থাম শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া!
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার পথ
তরিয়া।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রস-সাধনার ইহাই শেষ কথা নয়। 'সীমার মধ্যে অসীমের লীলা চলিতেছে' ইহাই যাঁর রসসাধনার চরম উপলব্ধি, সংসার সম্বন্ধে এরূপ অনাস্থা এবং বীতরাগ তাঁহার সাধন-পথের সাময়িক অভিজ্ঞতা মাত্র।

'মানসী' পর্য্যন্ত আমরা কবির এই মানসিক ধারার জের দেখিতে পাই। 'সোনার তরীতে' আসিয়া কবি প্রথম জানিতে পারিলেন—সৃষ্টিটা ফাঁকি নয়, সংসার আমাদের পূর্ণতার পথে বাধা নয়, তাহা

আমাদিগকে অনন্তের পথে, পূর্ণতার পথে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সীমাবদ্ধ সৃষ্টির মধ্যেই অসীমের ইঙ্গিত বর্ত্তমান।

এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৈষ্ণব লীলাতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে কবি 'ভানু সিংহের পদাবলী' রচনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার মধ্যে বৈষ্ণব-লীলাতত্ত্বের লেশ মাত্র ছিল না। 'সোনার তরীর' মধ্যে আসিয়া কবি প্রথম বৈষ্ণব লীলাতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি 'সোনার তরীর' মধ্যে 'বৈষ্ণব কবিতা' নাম দিয়া যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁর এই সৃষ্টিকে নূতন চোখে দেখার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে 'মানসী' পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, কবি সৃষ্টিকে খুব ভাল চক্ষে দেখেন নাই। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল, সৃষ্টির মধ্যে কিছুই নির্ভর করিবার মত নাই। সৃষ্টিকে অস্বীকার করিয়া তবে স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়। 'সোনার তরীতে' আসিয়া কবি প্রথম উপলব্ধি করিলেন, সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার আসন পাতা রহিয়াছে। আমাদের পার্থিব প্রিয়জনের মধ্যেই সেই শাশ্বত প্রিয়তমের ইঙ্গিত বর্ত্তমান। কবি এতদিন জানিতেন, দেবতাকে যাহা দেওয়া যায় মানুষকে তাহা দিলে দেবতা রুষ্ট হন। 'মানসীর' মধ্যে কবি তাই বলিয়াছেন—

বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে!

কিন্তু 'সোনার তরীতে' আসিয়া কবি বলিতেছেন—

আমাদেরি কুটীর, কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে,

কেহ রাখে প্রিয়জন তরে, তাহে তাঁর
নাই অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়;
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

'মানসীর' কবি একদিন তাঁর কল্পিত প্রিয়াকে, ভাল বাসিতে গিয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন. তাঁর ধারণা ছিল, পার্থিব প্রিয়ার ভালবাসা বুঝি ভগবৎ-প্রেমের পরিপন্থী। আজ কিন্তু তাঁর আর সে ধারণা নাই। আজ সীমাবদ্ধ সৃষ্টি সীমাতীতের পথে বাধা দান করে না,—আজ কবি সীমার মধ্যেই অসীমের সন্ধান পাইয়া গিয়াছেন। তাই সৃষ্টি আজ কবির নিকট সুন্দর হইয়া দেখা দিয়াছে;—সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা আজ তাই কবিচিত্তকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিতেছে না।

পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি 'মানসী' পর্য্যন্ত কবি সৃষ্টি সম্বন্ধে একেবারেই আস্থাবান্ ছিলেন না। তাই 'মানসীর' শেষ পর্য্যন্ত কবি সংসারকে অস্বীকার করিয়া সংসারের বাহিরের এক বিরাটতর সত্তার উপর নির্ভর করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন. 'সোনার তরীর' মধ্যে আসিয়া কবির এই ধারণাটির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। 'সোনার তরীর' অন্তর্গত 'আকাশের চাঁদ', "দেউল', 'পরশপাথর', বিশ্বনৃত্য' প্রভৃতি কবিতা তাঁর এই পরিবর্ত্তিত মনোবৃত্তির নূতন দান।

'আকাশের চাঁদ' নামক কবিতাটির মধ্যে কবি বলিতেছেন—কোনও একটি লোক আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া ধরিতে চায়—

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ
এই হল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া
কাঁদে সে দুহাত তুলি।

পৃথিবীর চারিদিকে কত শোভা-সম্পদ ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, যাহা ইচ্ছা করিলেই সে অনায়াসে ভোগ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তার আস্থা নাই।

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে
• অযাচিত ফুল দল,
দখিন সমীর বুলায় ললাটে
দক্ষিণ করতল।

প্রভাতের আলো আশিষ পরশ
করিছে তাহার দেহে,
রজনী তাহারে বুকের আঁচলে
ঢাকিছে নীরব স্নেহে।

কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর
কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি ;
পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে
লইতে বন্ধু করি ;

এই পথে গৃহে কত আনাগোনা;
কত ভালবাসাবাসি,
সংসার সুখ কাছে কাছে তার
কত আসে যায় ভাসি',

মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া
কহে সে নয়ন জলে,—
তোমাদের আমি চাহি না কারেও,
শশী চাই করতলে।

এমনি করিয়া লোকটি চাদ ধরিবার জন্য উর্দ্ধে হাত বাড়াইয়া রহিল ; একবার ভাবিয়া দেখিল না, পৃথিবীতে ঠিক চাঁদ না থাকিলেও, চাঁদের শোভা নানা ভাবে আপনাকে পরিকীর্ণ করিয়া দিতেছে—হাত বাড়াইলেই ধরা যায়। তাহাতে করিয়া ফল হইল এই যে—।

শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল,
সেও বসে এক ঠাই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই,

এমন সময়ে সহসা কি ভাবি’,
চাহিল সে মুখ ফিরে
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।

সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোট ছোট তরী পাল তুলে যায়
মাঝি বসে গায় গান।

দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর,
বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থ জন
আসিছে গ্রামের হাটে।
নিশ্বাস ফেলি' রহে আঁখি মেলি'
কহে ম্রিয়মাণ মন,
শশী নাহি চাই, যদি ফিরে পাই
আরবার এ জীবন।

•

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মানসী' পর্য্যন্ত যে দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কবি সৃষ্টির পানে তাকাইয়াছিলেন, তাহারি বিপক্ষে যথেষ্ট কটাক্ষ এই কবিতাটির মধ্যে বর্ত্তমান।

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবি সৃষ্টিকে একেবারেই একটা অন্ধ নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ-যন্ত্র মাত্র মনে করিতেন। ইহার মূলে ছিল মৃত্যুভয়। তাহার পর 'প্রভাতসঙ্গীতে' কবি মৃত্যুর মধ্যে যখন নব নব জীবনের সুর শুনিতে পাইলেন এবং জানিতে পারিলেন, মৃত্যুর মধ্যে ধ্বংসই শেষ কথা নয়, তখন তিনি মনে করিলেন, তবে বুঝি জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান তিনি করিয়া ফেলিয়াছেন,—জীবনে বুঝি আর কোন অভাব অভিযোগের কারণ ঘটিবে না। তখন তিনি অতিরিক্ত রকম উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। 'প্রভাতসঙ্গীতের' মধ্যে তাই উৎফুল্লতার আতিশয্য এত বেশি করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবির এ উৎফুল্লতা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারিল না—হইতে পারেও না। মৃত্যু নবজীবনের সৃষ্টি করে, একথা জানিয়াও মানুষ কোনদিন শান্তি পাইতে পারে না। কেন না, এ সত্যের দ্বারা আমরা এইটুকুমাত্র সান্ত্বনা লাভ

করিতে পারি, যে আমাদের জীবনধারা কোনদিন শেষ হইয়া যাইবে না, তাহার প্রবাহ অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে। কিন্তু জীবনটা নিজেই ত খুব সুখের নয়, তবে তাহাকে অনন্তকাল ধরিয়া বহিয়া লইয়া যাওয়ায় সুখ কোথায়? এ এক নূতন সমস্যা কবির মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। কবি তখন জীবনধারার এই অশ্রান্ত প্রবাহের বাহিরে এমন কিছুর সন্ধান করিতে লাগিলেন, যেখানে গিয়া এই জীবনধারা একদিন আপনার শেষ সার্থকতা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, জীবনের এই অশ্রান্ত প্রবাহ ত তবে একেবারে নিরর্থক নয়, কেন না, ইহা তাঁহাকে তাঁর শেষ পরিপূর্ণতার দিকেই ত লইয়া যাইতেছে। কিন্তু তথাপি ইহা পথ মাত্র, ইহা তাঁহাকে তাঁহার কাম্যবস্তুর অভিমুখে চালাইয়া লইয়া যাইবার উপায় মাত্র। সুতরাং পথ যতই সংক্ষেপ হইয়া আসে, তাঁর ঈপ্সিতের সহিত মিলনের শুভমুহূর্ত্তটি ততই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। তাই জীবনটাকে কবি সংক্ষেপে সারিয়া লইতে চাহিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, জীবনপ্রবাহ যতশীঘ্র শেষ হইয়া যায় ততই মঙ্গল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই জীবনের প্রতি বীতরাগ দেখা দিল; তাই 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীর' মধ্যে এত সন্দেহ, এত ক্ষুব্ধতা, এত অনাস্থা। এখন পর্য্যন্ত কবি জানিতে পারেন নাই, জীবনপ্রবাহ আমাদের শুধু ঈপ্সিতের দিকে লইয়া যাইতেছে না,—জীবনের মধ্যেই বারবার আমরা সেই ঈপ্সিততমের সঙ্গসুখ লাভ করিতেছি,—জীবনের মধ্যেই জীবনেশ্বরের পূজা চলিতেছে। 'সোণার-তরীতে' আসিয়া কবি প্রথম এই সত্যটির সন্ধান পাইলেন। এ যেন এক নূতন আবিষ্কার। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' পর 'প্রভাতসঙ্গীতের' মধ্যে মৃত্যুরহস্য সমাধান করিয়া কবি একদিন যেমন আনন্দের আতিশয্যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন,

'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীর' পর কবি তেমনি তাঁর 'সোণার-তরীর' মধ্যে সৃষ্টিরহস্য সমাধান করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। আজ আর কবিকে বলিতে হয় না—"বিশ্ববিহীন বিজনে তোমায় বরণ করি।" কবি আজ বিশ্বের মধ্যেই বিশ্বেশ্বরকে পাইতে চান। কবি এতদিন বিশ্ব হইতে তাঁর দেবতাকে আলাদা করিয়া, আড়াল করিয়া, নিজের মনগড়া 'দেউলের' মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে চাহিয়াছিলেন।

রচিয়াছিনু দেউল একখানি
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি'।
রাখিনি তার জানালা দ্বার,
সকল দিক অন্ধকার,
ভূধর হতে পাষাণভার
যতনে বহি আনি'.
রচিয়াছিনু দেউল একখানি।

দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে।
বাহিরে ফেলি' এ ত্রিভুবন
ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ
করেছি এক প্রাণে,
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে।

তারপর কবি তাঁর দেবতাটিকে বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া, নিভৃতে একান্তে তাঁর পূজা করিতে লাগিলেন,—সৃষ্টির সহিত কোন সম্পর্ক রাখিলেন না। এমন কি, তাঁর এই নির্জ্জন মন্দির-ভিত্তি-গাত্রে তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করাইলেন, তাহার সহিতও সৃষ্টির কোন সম্পর্ক রহিল না।

সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত।
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
ফুলের মত লতার মাঝে
নারীর মুখ বিকশি রাজে,
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে
নয়ন করি' নত,
সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত।

শুধু তাই নয়, সৃষ্টির আলোক-বাতাস পর্য্যন্ত তিনি এই নির্জ্জন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।

তারপর একদিন সহসা ভীষণ ঝড় উঠিল—

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি' পড়িল মোর ঘরে।
* * *
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি'
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি'।

*　　*　　*

কবি বলিতেছেন,—তখন—

দেবতা পানে চাহিনু একবার ;
আলোক আসি' পড়েছে মুখে তাঁর।
নূতন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি',
জাগিছে এক প্রসাদহাসি
অধর চারিধার।
দেবতা পানে চাহিনু একবার

কবি তখন দেখিলেন—

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।

'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীর' মধ্যে কবি বিশ্বেশ্বরকে বিশ্ব হইতে আলাদা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'সোণার-তরীতে' আসিয়া তাঁর সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। আজ স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, সীমা এবং অসীম কবির নিকট একই সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে,—আজ সৃষ্টির এই অবিশ্রাম চঞ্চল পদবিক্ষেপের মধ্যে কবি নটরাজের নৃত্যছন্দ শুনিতে পাইলেন।

ওগো কে বাজায়—বুঝি শুনা যায়—
মহা রহস্যে রসিয়া
চিরকাল ধরে' গম্ভীর স্বরে
অম্বর পরে বসিয়া।

গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল,
গগনে গগনে জ্যোতি অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।
ওগো কে বাজায়—কে শুনিতে পায়—
না জানি কি মহা রাগিণী।
দুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।
ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে,
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে',
কি গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে'
মর্ম্মরে দিন যামিনী।

* * * *

নাচে ছয় ঋতু না মানে বিরাম,
বাহুতে বাহুতে ধরিয়া।
শ্যামল, স্বর্ণ, বিবিধ বর্ণ
নব নব বাস পরিয়া।

এমনি করিয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে কবি যে অনাস্থা এবং অবিশ্বাস এতদিন বুকের মধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, 'সোণার-তরীর' মধ্যে আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তচ্‌নচ্‌ হইয়া গেল। কবি পূর্ণবিশ্বাসে আজ সৃষ্টির পানে তাকাইলেন। সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয় আজ কবির নিকট অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। ঠিক এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'গল্পগুচ্ছ' লেখা আরম্ভ করেন। 'গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলির দিকে যিনি একবারও

অন্ততঃ তাকাইয়াছেন, তিনিই জানেন, এই সকল গল্পের মধ্যে মানব-জীবনের অতিবড় সামান্য খুটিনাটি ব্যাপার গুলিকেও কবি কি অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সহিত দেখিয়াছেন।

তাছাড়া, কাব্যের দিক হইতেও 'সোণার-তরীর' অন্তর্গত 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে সৃষ্টির প্রতি কবির কি অপূর্ব্ব দরদ এবং ভালবাসা প্রকাশ পাইয়াছে! বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলাপরা তব কটিদেশ;
প্রভাত রৌদ্রের মত অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের পরে
করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন
প্রত্যেক কুসুমকলি, করি আলিঙ্গন
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি,
প্রত্যেক তরঙ্গপরে সারাদিন তুলি
আনন্দদোলায়। রজনীতে চুপে চুপে
নিঃশব্দ চরণে, বিশ্বব্যাপী নিদ্রারূপে
তোমার সমস্ত পশুপক্ষীর নয়নে
অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে,

নীড়ে নীড়ে, গৃহে গৃহে, গুহায় গুহায়
করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চলপ্রায়
আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি
সুস্নিগ্ধ আঁধারে।

'সোণার-তরীর' শেষ দিকে কবি মায়াবাদকে যে বার বার আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে তাঁর নিজেকে আক্রমণ করার মতই দেখায়। 'সোণার-তরীর' মধ্যে তিনি যখন মায়াবাদকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—

যুগযুগান্তর ধরে পশুপক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি ;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই করনা বিশ্বাস।
লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা,
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।

তখন সে নিন্দাবাদ কবির নিজের গায়ে আসিয়াও লাগিয়াছে। অনেকে মনে করেন, কবির এই সকল কবিতা মায়াবাদের প্রতিবাদ মাত্র। আমার কিন্তু মনে হয়, ইহা তাঁহার নিজের পূর্ব্বধারণার প্রতি কটাক্ষপাতও বটে।

'সোণার-তরীর' পর আমরা কবির 'চিত্রা' কাব্যখানি পাইতেছি।

'চিত্রার' মধ্যে আসিয়া কবি একবারে নিশ্চিন্তমনে, নিরুদ্বেগে সৃষ্টির সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। সৃষ্টি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া কবি তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যপিপাসা প্রাণ ভরিয়া মিটাইয়া লইয়াছেন।

একটা জিনিষ এই সঙ্গে লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চিত্রা' পর্য্যন্ত আসিয়া আমরা কবির মনোবৃত্তির একটি চমৎকার সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই, কবির চিন্তাধারা বরাবর এক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, কবির মনের মধ্যে গোটাকতক সমস্যার উদয় হইয়াছে এবং এই সমস্যাগুলি কবিকে ক্রমাগত অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। কবি-চিত্তের এই অস্থিরতা, এই অশান্তি কবিকে একনিমেষের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেয় নাই। তারপর 'প্রভাতসঙ্গীতের' মধ্যে সে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সে সমস্যা যে কি এবং সে সমস্যার সমাধান যে কবি কেমন করিয়া করিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক কথা একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মনে করি।

'প্রভাতসঙ্গীতের' মধ্যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবার পর কবি 'ছবি ও গান' নামক কাব্যখানি লিখেন। এই কাব্যখানির অন্তর্গত কবিতাগুলি যেমন হাল্কা, তেমনি সুন্দর। অল্প বয়সের রচনা হিসাবে এই কাব্যগ্রন্থখানি চমৎকার হইয়াছে। কবির অপরিণত বয়সের রচনা বলিয়া ইহার মধ্যে অনেক দোষ-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে কবিহৃদয়ের যে স্নিগ্ধতা এবং রূপমুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অপূর্ব্ব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'ছবি ও গান' কবির জীবনের সেই শুভমুহূর্ত্তে রচিত, যে সময় কবি তাঁর 'প্রভাতসঙ্গীতের' মধ্যে জীবনের অনেক কিছু

সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়া হৃদয়কে অনেকটা ভারমুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুইটি মানুষ বরাবর পশাপাশি বাস করিয়া আসিয়াছে,—তাহাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন দার্শনিক এবং অপরটি হচ্ছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার এই দার্শনিকটি তাঁর জীবনের যত কিছু সমস্যার সমাধান করিতে করিতে চলেন এবং তাহার পর তাঁর ভিতরকার কবিটি নিশ্চিন্তমনে জীবনকে উপভোগ করিয়া চলিতে থাকেন। একজন পথ পরিষ্কার করিয়া চলিতেছেন, অপর আর একজন নিরুদ্বেগে, নির্ব্বিঘ্নে সেই পথের দুধারের দৃশ্যাবলী উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাতসঙ্গীতের' মধ্যে আমরা পাই পথ পরিষ্কারের ইতিহাস, আর 'ছবি ও গানের' মধ্যে আমরা পাই পথ চলার আনন্দের ইতিহাস।

তারপর 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীর' মধ্যে আবার নূতন সমস্যা দেখা দিল। সে সমস্যা যে কি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তারপর 'সোণারতরীর' মধ্যে কবি সে সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিলেন—সুতরাং আবার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। ইহার পর 'চিত্রার' মধ্যে আমরা কবির পথচলার যে ইতিহাস পাই, তাহা যেমন সুন্দর তেমনি রসঘন। রচনা-নৈপুণ্যের দিক হইতে যতই পার্থক্য থাকুক্ না কেন, ভাষার দিক হইতে এবং ছন্দের দিক হইতে যতই পার্থক্য থাকুক্ না কেন, কবির মানসিক বৃত্তি এবং অনুপ্রেরণার দিক হইতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', প্রভাতসঙ্গীত, 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীকে' আমরা এক হিসাবে সমশ্রেণীভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। আবার অন্যদিক হইতে ধরিতে গেলে, কবির 'ছবি ও গান' এবং 'চিত্রাকে' একই শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারা যায়।

'ছবি ও গান' এবং 'চিত্রার' মধ্যে আমরা কবির পরিপূর্ণ উপভোগের ইতিহাসটি খুঁজিয়া পাই। তাহার মধ্যে সন্দেহ নাই, সমস্যা সমাধানের বালাই নাই—একেবারে নিছক উপভোগ। 'ছবি ও গানের' কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং এইবার 'চিত্রার' মধ্যে আসিয়া পড়া যাক্।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'সোণার-তরীর' মধ্যে আসিয়া কবি প্রথম বুঝিলেন, সৃষ্টি এবং স্রষ্টা পরস্পরের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। তৎপূর্ব্বে 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীর' মধ্যে কবি সৃষ্টির প্রতি যে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। 'সোণার-তরীর' মধ্যে আসিয়া কবি যখন বুঝিলেন, সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার লীলা চলিতেছে, তখন সৃষ্টির প্রতি তাঁর হারান শ্রদ্ধা আবার ফিরিয়া আসিল। তাই 'চিত্রার' মধ্যে কবি নিঃসন্দেহে, চোখ বুজিয়া সৃষ্টিকে উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ, এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সন্দেহ তাঁর সৌন্দর্য্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিতে পারে নাই।

তাই 'চিত্রার' কবিতাগুলির মধ্যে কবি-হৃদয়ের পরিপূর্ণ উপভোগের যে ইতিহাসটি আমরা পাই, তাহা অপূর্ব্ব। কি নিবিড়, পরিপূর্ণ শান্তি বুকে করিয়া কবি প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা 'চিত্রার' একটি কবিতার দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়—

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত ; সুন্দর বাতাস
মুখে, চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায় ; ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি

তরল কল্লোলে ; অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি', যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে ; ভাঙ্গা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটীর ;
বক্র শীর্ণ পথ খানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত ; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ মগন
করিছে কৌতুকালাপ ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি' পশিতেছে আসি'
কর্ণে মোর; বসি এক বাঁধা নৌকাপরি
বৃদ্ধ জেলে গাথে জাল নতশির করি'
রৌদ্রে পিঠ দিয়া ; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে ; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহজ্বালাতন।
তীর হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার ;
মধ্যাহ্ন আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা ; আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ ; কভু রহি' রহি'
বিহঙ্গের শ্রান্তস্বর। * *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'সোণার-তরীর' সময় হইতে কবি সৃষ্টির পানে পরিপূর্ণ বিশ্বাসে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ফলে আমরা 'গল্পগুচ্ছের' অপূর্ব্ব গল্পগুলি পাই। জীবনের অতিবড় খুটি নাটি ব্যাপার এই সময় কবির নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইয়াছে। 'চিত্রার' মধ্যে যদিই বা একটু আধটু চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, 'চৈতালির' মধ্যে কবি একবারে নিশ্চিন্ত হইয়া সৃষ্টির প্রত্যেক খুটি নাটি ঘটনাটিকে পর্য্যন্ত আকুল আগ্রহে উপভোগ করিয়া লইয়াছেন। 'চৈতালির' অন্তর্গত 'মধ্যাহ্ন' নামক কবিতাটি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, কবি কি ভাবে আপনার মনকে সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য করিয়া, নীরবে বসিয়া মধ্যাহ্নের অলস শান্তিটুকু উপভোগ করিতেছেন। প্রকৃতির অতিবড় সামান্য ব্যাপারটিও তাঁর পিপাসার্ত্ত চক্ষুদুটির দৃষ্টি এড়াইতে পারিতেছে না।

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরীপরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যাম-শষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের পরে

ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।

চৈতালির পর আমরা পাই 'কাহিনী' 'কল্পনা', 'কথা', 'ক্ষণিকা' এবং 'কণিকা'। এই কয়টি কাব্যগ্রন্থের ভিতর দিয়া কবির সৃষ্টির প্রতি এবং মানবজীবনের প্রতি কি অখণ্ড শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা প্রকাশ পাইয়াছে!—সেই সোণার-তরীর' জের এখনও চলিতেছে।

'সোণার-তরীর' পর হইতে 'কণিকা' পর্য্যন্ত কবি একবারে নিছক শিল্পী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'সোণার-তরীর' মধ্যে আসিয়া কবি প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে আস্থাবান হইয়া উঠিলেন। তার পূর্ব্বে যে সৃষ্টিসৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করে নাই তাহা নয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধের সহিত নানান সমস্যা আসিয়া জুটিয়া পরিপূর্ণ উপভোগের পথে বাধা দিতেছিল। এই যে দ্বিধা, এই যে সন্দেহ, এই যে সঙ্কোচ, এই যে ক্ষুণ্ণতা, ইহারা এতদিন কবিকে পূর্ণভাবে সৃষ্টিকে উপভোগ করিতে দেয় নাই। 'সোণার-তরীর' মধ্যে আসিয়া কবির সমস্ত সমস্যা এক নিমেষে সমাধান হইয়া গেল;—এখন কবির উপভোগের পালা। তাই 'সোণার-তরীর' পর হইতে 'কণিকা' পর্য্যন্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের যে সকল কবিতা পাই, তাহা শিল্প হিসাবে একবারে অতুলনীয়। তাই 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'কথা', 'ক্ষণিকা', এবং 'কণিকার' মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাছা বাছা শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিকে আমরা পাই। আমার মনে হয়, 'সোণার-তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'কথা' এবং 'ক্ষণিকা' এই কয়টি কাব্যগ্রন্থকে লইয়া যে যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে রবীন্দ্রনাথের রসজীবনের শ্রেষ্ঠতম যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভবঘুরে মন একজায়গায় বেশি দিন সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'সোণার-তরীর' মধ্যে কবি বৈষ্ণবলীলাতত্ত্বটিকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এখন হইতে তাঁর ধারণা হইয়াছে,—সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার স্পর্শ আমরা প্রতিনিয়ত পাইতেছি,—তাঁহাকে খুঁজিতে অন্য কোথাও যাইবার দরকার করে না।

এখন আর কবিকে বলিতে হয় না—

বিশ্ববিহীন বিজনে তোমায় বরণ করি।

এখন কবি বলেন—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, তাই দিই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

কিন্তু এ কথা বলিয়া কবি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুইটি মানুষ বরাবর বাস করিয়া আসিতেছে, একটি দার্শনিক এবং অপরটি কবি। তাঁর মধ্যে কবি বলিয়া যে মানুষটি বাস করে, সে কেবল উপভোগের সন্ধানে ফিরিতেছে, কিন্তু তাঁর মধ্যে দার্শনিক বলিয়া যে দ্বিতীয় মানুষটি আছে, সে মাঝে মাঝে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া কবির এই উপভোগের পথটিকে বহুমুখী করিয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার এই দার্শনিকটি কবির উপভোগকে কোনদিন একঘেয়ে হইয়া উঠিতে দেয় নাই। কবির অন্তস্তলবাসী এই অদৃশ্য দার্শনিকটি যেই দেখিয়াছে, তিনি সৃষ্টিকে একদিক হইতে উপভোগ করিতে

করিতে একঘেয়ে করিয়া তুলিতেছেন—অমনি একটি নূতন সমস্যা আনিয়া কবির একঘেয়ে উপভোগের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তখন কবিকে নূতন পথের সন্ধানে ফিরিতে হইয়াছে। ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া এই নূতন পথের সন্ধান চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আমরা কবির নিকট হইতে যে সকল কবিতা পাই, তাহা রসের দিক হইতে খুব উচ্চ-শ্রেণীর হয় না। তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধ অপেক্ষা সমস্যা সমাধানের আনন্দই বেশি করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাহার পর এমনি করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে কবি যখন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, তখন আর কবিকে পায় কে!—তখন কবির নিকট হইতে আমরা এই নূতন পথের দুধারের যে সকল নূতন, অভিনব সৌন্দর্য্য-উপভোগের ইতিহাস পাই, তাহা অপূর্ব্ব। এমনি করিয়া কবির অন্তস্তলবাসী এই দার্শনিকটি কবিকে কোনদিন একঘেয়ে হইয়া উঠিতে দেয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা সৌন্দর্য্য-উপভোগের যত বিভিন্ন দিকের সন্ধান পাই, এতটা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন কবির মধ্যে পাওয়া যায় না।

যাক্, আসল কথা ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। বলিতে-ছিলাম, কবি 'দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতা' করিয়া তুলিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁর অন্তস্তলবাসী ভবঘুরে দার্শনিকটি আবার এক নূতন প্রশ্ন তুলিল। সে প্রশ্নটি এই যে, সৃষ্টির মধ্যেই না হয় লীলাময়ের লীলা চলিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া সৃষ্টিকে উপভোগ করিলেই কি আপনা হইতে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা হইল?—সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার লীলা চলিতেছে—এ বিষয়ে সচেতন হইয়া সৃষ্টিকে উপভোগ না করিলে কি এই লীলাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়?—তা যদি হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক শিল্পীই ত সাধক হইয়া উঠিতেন। সৃষ্টি ত অনেককেই মুগ্ধ করে; এই মুগ্ধ হওয়াটাই কি যথেষ্ট?—আমাদিগকে কি সেই সঙ্গে

আর একটি সত্তার সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে না ?—এই সকল প্রশ্নের জবাব আমরা পাই 'নৈবেদ্যে'।

'সোণার তরীর' পর হইতে কবি সৃষ্টিকে নিছক শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং উপভোগ করিয়াছেন। 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'কথা' এবং 'ক্ষণিকা' ইহারা নিছক সৌন্দর্য্যভোগের ইতিহাস। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবির ভিতরকার দার্শনিকটি আবার নূতন প্রশ্ন তুলিল। সে বলিল—এই যে উপভোগ, ইহা ত সৃষ্টিকে আলাদা করিয়া উপভোগ,—ইহার সহিত স্রষ্টার সম্বন্ধ কোথায় ?—সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার লীলা চলিতেছে এ কথা জানিবার পর সৃষ্টি মধুর হইয়া উঠে—এ কথা সত্য, কিন্তু তারপর যদি সৃষ্টির মাধুর্য্যটাই সবখানি হইয়া উঠে, তখন স্রষ্টা যে ঢাকা পড়িয়া যান। সুতরাং সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য-উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে ত চলিবে না। 'নৈবেদ্যে' আসিয়া কবি তাই বলিলেন—

> জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিশীথের নিস্তব্ধ প্রহরে
> আনন্দে বিষাদে গাঁথা ছায়ালোক পরে
> বস তুমি মাঝখানে! শান্তিরস দাও
> আমার অশ্রুর জলে, শ্রীহস্ত বুলাও
> সকল স্মৃতির পরে, প্রেয়সীর প্রেমে
> মধুর মঙ্গলরূপে তুমি এস নেমে!

তাই কবি আকুল আগ্রহে বলিতেছেন—

> তোমার ভুবন মাঝে ফিরি মুগ্ধসম
> হে বিশ্বমোহন নাথ! চক্ষে লাগে মম

প্রশান্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাশ ;
শরৎমধ্যাহ্নে পূর্ণ সুবর্ণ উচ্ছ্বাস
আমার শিরার মাঝে করিয়া প্রবেশ
মিশায় রক্তের সাথে আতপ্ত আবেশ !
ভুলায় আমারে সবে ! বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায় ;
*   *   *   *
তার শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও, হে নাথ !

এমনি করিয়া 'নৈবেদ্যের' মধ্যে কবি বার বার সৃষ্টির সহিত স্রষ্টাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোথাও বা তিনি অনুভব করিতেছেন—সৃষ্টির অণুপরমাণুরা পর্য্যন্ত স্রষ্টার আসনখানিকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতেছে—

শুনিতেছি তৃণে তৃণে, ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্য্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে'
অণু পরমাণুদের নৃত্যকলরোল,—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল !

আবার কোথাও তিনি অনুভব করিতেছেন—

সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘটনে ঘরে,
সব চিত্তে, সব চিন্তা, সব চেষ্টা পরে
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা !

ইহার পর আমরা আসিয়া পড়ি 'খেয়ায়'। 'খেয়ার' মধ্যে আমরা যে মূল-সুরটি পাই, তাহা 'নৈবেদ্যের' সুর হইতে এক পর্দা চড়া। 'নৈবেদ্যের' কবি সৃষ্টির সহিত স্রষ্টাকে সংযুক্ত করিয়া উপভোগ করিয়াছেন। 'খেয়াতে' আসিয়া সৃষ্টির দিক হইতে কবির দৃষ্টি ক্রমে স্রষ্টার দিকেই ধাবিত হইয়াছে।

'সোণার তরীর' ভিতর কবি প্রথম সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার লীলা উপলব্ধি করিলেন। এই উপলব্ধির পর সৃষ্টি তাঁহার নিকট অপূর্ব্ব হইয়া উঠিল ; তাহার ফলে, কবি সৃষ্টিকে এমন নিবিড় ভাবে উপভোগ করিতে লাগিলেন, যে স্রষ্টার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন, এবং তাহাতে করিয়া কবির নিকট হইতে আমরা যে সকল কবিতা পাইলাম, রসের দিক হইতে, শিল্পের দিক হইতে তাহারা অপূর্ব্ব। তাহার পর 'নৈবেদ্যের' মধ্যে আসিয়া কবি আবার একবার নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। হঠাৎ তাঁহার হুঁস হইয়া গেল, হয়ত তিনি বড্ড বেশি সৃষ্টিসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিতেছেন ; ফলে 'নৈবেদ্যের' মধ্যে আমরা যে সকল কবিতা পাই সেগুলি সৃষ্টি এবং স্রষ্টার একত্র উপলব্ধির ইতিহাস। কিন্তু এইভাবে কবি বেশিদিন থাকিতে পারিলেন না। 'সোণার তরীর' মধ্যে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার লীলাতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া কবি যেমন একদিন সৃষ্টির দিকেই চলিয়া পড়িয়াছিলেন, 'নৈবেদ্যের' মধ্যে আবার সেই সৃষ্টি এবং স্রষ্টার লীলাতত্ত্বটি ফিরিয়া উপলব্ধি করিয়া কবি চলিয়া পড়িলেন স্রষ্টার দিকে। এখন হইতে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে কবি পর্য্যায়ক্রমে উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছেন। দুইটিকে এক সঙ্গে উপভোগ করা চলে, কিন্তু তাহাতে যেন প্রাণ ভরে না। তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে সম্মিলিত অবস্থায় দেখার পরও কবির ইচ্ছা হয়, এই দুইটিকে আলাদা করিয়া ঘনিষ্ঠভাবে নিবিড়তর করিয়া উপলব্ধি করি।

ইহার পর 'খেয়াতে' আসিয়া কবি কেমন করিয়া নীড় ছাড়িয়া

মুক্তাকাশে উধাও হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আর নদীতীরের দুইধারের মোহন দৃশ্য তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না—নীল সাগরের 'নির্জ্জন গান' এখন তাঁহার চিত্তকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। এতদিন কবির সহিত নদীতে নদীতে ঘুরিয়া বেড়ান হইল, এইবার তাঁহার সহিত দিনকতক নীল সাগরের বুকে দিশেহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান যাক্। এখন কবির সহিত গলা মিলাইয়া আমরাও বলি—

যাক্ না মুছে তটের রেখা,<br>
নাইবা কিছু গেল দেখা ;<br>
অতল বারি দিক্ না সাড়া<br>
বাঁধন হারা হাওয়ার সাথে।

# অরূপ

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির অন্তর্গত গীতিকবিতাগুলির বিপক্ষে যে অভিযোগটি প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই সকল কবিতা অত্যন্ত বেশি অস্পষ্ট এবং জটিল। এগুলি যে সাধারণ কবিতার মত স্পষ্ট নয় এবং এগুলিকে বেষ্টন করিয়া যে একটা রহস্য-কুহেলিকা ঘনাইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন কথা হইতেছে, এই যে অস্পষ্টতা, এই যে আবছায়া, ইহার মূল কোথায়?

কোন কবির কবিতা সাধারণতঃ তখনই অস্পষ্ট হইয়া উঠে, যখন তাঁহার বক্তব্যবিষয় তাঁহার নিজের কাছেই সুস্পষ্ট আকারে ধরা না দেয়। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্পীরই একটা কিছু দিবার থাকে, একটা কিছু বলিবার থাকে। এই বাণীটি যখন কবির নিজের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া না উঠে তখন তাহার প্রকাশও জটিল এবং অস্পষ্ট না হইয়া পারে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই যে অস্পষ্টতা, এই যে স্বপ্নকুহেলিকা, ইহার জন্য কি কবির অনুভূতিকেই দায়ী করিতে হইবে?—তবে কি বলিতে হইবে রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুভূতির মূলেই কোথায় অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে?

এই সকল অভিযোক্তারা বলিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথের অতিবড় আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির ভিতর যে গভীর ভাব বর্ত্তমান, তাহা লইয়া ইতিপূর্ব্বে কত কবি কত কবিতাই রচনা করিয়া গিয়াছেন, অথচ সেগুলি ত অমন অস্পষ্টতাদোষদুষ্ট হইয়া উঠে নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে

ভাবের গভীরতা বা ভাবের অতীন্দ্রিয়তা তাঁর কবিতাকে অস্পষ্ট করিয়া তুলে নাই—অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে তাঁর প্রকাশভঙ্গির অক্ষমতা। তাহা ছাড়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন—ভাব যতই গভীর হউক না কেন, কবি যদি তাহাকে আন্তরিক ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার যদি সত্যকারের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা অস্পষ্ট থাকিতে পারে না। তবে কি বলিতে হইবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি তাঁহার অন্তরের কথা নয়—মুখের কথা মাত্র?

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাহারা বলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই যে অস্পষ্টতা, ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত। তাঁহারা বলেন, বৈষ্ণবপদাবলীর ভিতরকার ভাব এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব প্রায় একই—সেই সীমার মধ্যে অসীমের লীলা! অথচ বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা বা জটিলতার লেশ মাত্র নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদি অস্পষ্ট বা জটিল হইয়া উঠে তবে তাহার জন্য দায়ী তিনি নিজে,—তাঁহারি কবিতার বিষয়বস্তু বা ভাবদেহ নয়।

এ কথার জবাব দিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের এই সকল কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা দরকার।

অনেকের ধারণা কবিতার প্রকৃতি নিরূপণ করে তাহার বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর সহিত কবিতার প্রকৃতির যে একেবারেই কোন সম্পর্ক নাই একথা বলিতে চাই না, কিন্তু বিষয়বস্তুই যে কবিতার প্রকৃতিনিরূপণ ব্যাপারে সর্ব্বময় কর্ত্তা, একথা বলিলেও ভুল করা হইবে। বিষয়বস্তুই যদি কবিতার প্রকৃতিনিরূপণব্যাপারে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে একই বিষয়বস্তুকে লইয়া কবিতা লিখিতে বসিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবি কোন দিন বিভিন্ন প্রকৃতির কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না।

আমার মনে হয় কবিতার বিষয়বস্তুর উপর তাহার প্রকৃতি খুব বেশি

নির্ভর করে না। কারণ, কবিতার প্রকৃতি তাহার গতির ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে—তাহার বাহির হইতে নয়।

ছুটির দিনে যে কেরাণীবাবুটি হন্তদন্ত হইয়া টিকিট কাটিয়া ট্রেণে গিয়া উঠিলেন, তিনি ক্রমাগত ভাবিতেছেন, কতক্ষণে পথ শেষ হইবে, কতক্ষণে দুধারের ঐ সবুজ মাঠের শ্যামশোভা একটি খড়ের ছাউনিতে আসিয়া নিজেকে নিঃশেষে হারাইয়া ফেলিবে, কতক্ষণে তিনি বাড়ী পৌঁছিয়া কাচ্চাবাচ্চাগুলির মুখ দেখিবেন। দুধারের ঐ সবুজ মাঠ তাঁহার কাছে পথ; ঐ উদার উন্মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্র তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিবার পথ মাত্র। এখানে বাড়ী এবং তাহার পথ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির জিনিষ। একটা হচ্ছে উদ্দেশ্য, আর একটা হচ্ছে উপায়। একটার সহিত সম্পর্ক ভোগের, আর একটার সহিত সম্পর্ক প্রয়োজনের। পথকে মানুষ সংক্ষিপ্ত করিতে চায়, কেন না পথ যত সংক্ষিপ্ত হইবে, ঈপ্সিতের সহিত মিলনের শুভ মুহূর্তটি তত নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিবে। কিন্তু দল বাঁধিয়া যে যুবকের দল ছুটির দিনে ট্রেণে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে তাহারা কি করিবে? তাহারা চাহিবে পথ যেন না ফুরায়। আসল কথা যেখানেই একটা বাঁধাধরা উদ্দেশ্য আছে, সেইখানেই পথের প্রশ্ন আপনা হইতে উঠিয়া পড়ে,—সেইখানেই পথকে মানুষ আলাদা করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে বসে। কিন্তু কোথাও পৌঁছান যাহার উদ্দেশ্য নয়, শুধু কেবল বেড়াইবার জন্যই যে লোকটি পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কাছে পথ বলিয়া কোন জিনিষের অস্তিত্বই নাই। তাহার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে উদ্দেশ্য পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে সমস্ত পথ জুড়িয়া,—আলাদা করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া পথের বাহিরে কোথাও নয়। কবিতার উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু বলিয়া আলাদা কোন কিছুই নাই। তাহার

উদ্দেশ্য, তাহার বিষয়বস্তুকে আলাদা করিয়া দেখা যায় না, তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে কবিতাটির সমগ্র প্রকাশভঙ্গির মধ্যে, প্রত্যেক বাক্যে, প্রত্যেক শব্দে, প্রকাশভঙ্গির অণুতে পরমাণুতে।

এই সোজা কথাটা ভুলিয়া যাই বলিয়াই আমরা কবিতার ভাবকে তাহার প্রকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চেষ্টা করি, আর অমনি তাহা হইয়া উঠে তত্ত্ব। তখন আমাদের কাজ সোজা হইয়া আসে, তখন আমরা জোর গলায় চেঁচাইয়া উঠি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের লীলা এবং বৈষ্ণব কবিতার বিষয়বস্তুও ঠিক তাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই সকল কবিতা এবং বৈষ্ণবকবিতা একই প্রকৃতির রচনা। তখন অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই; আমরা তখন বলিয়া উঠি, দুইই এক প্রকৃতির কবিতা, অথচ বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা বা জটিলতার লেশ মাত্র নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদি অস্পষ্ট বা জটিল হইয়া উঠে তবে তাহার জন্য দায়ী তিনি নিজে, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু বা ভাব নয়। কিন্তু এইখানে আমাদের বক্তব্য এই, যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং বৈষ্ণব-কবিতার বিষয়বস্তু যদিই বা এক হয়, তবু ইহা বুঝায় না যে তাহাদের প্রকৃতিও অভিন্ন হইবে। কেন না পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিতার প্রকৃতি তার বিষয়বস্তুর উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে তার প্রকাশভঙ্গির উপর।

যাহারা বলেন, বৈষ্ণবকবিদের কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতার বিষয়বস্তু একই, সুতরাং দুজনের কবিতার প্রকৃতিও এক, তাঁহারা গোড়াতেই ভুল করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা কবিতার প্রকৃতি নির্ভর করে তাহার বিষয়বস্তুর উপর।

শুধু তাহাই নয়, তত্ত্বের দিক দিয়া এক হইলেও কবিতার প্রকৃতি

এক হইয়া উঠে না। তত্ত্বের দিক দিয়া ধরিলে বৈষ্ণব কবিদের মত প্রথম শ্রেণীর রসস্রষ্টাদের টানিতে হইবে কেন?—কবি চিরঞ্জীব শর্ম্মাই সে দিক হইতে যথেষ্ট। তাঁর—

জলে হরি, স্থলে হরি
অনলে অনিলে হরি
হরিময় এ ভূমণ্ডল।

তত্ত্বের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক কবিতা অপেক্ষা আপাত-দৃষ্টিতে কোন অংশে কম গভীর নয়। রবীন্দ্রনাথের—

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এলো মোর অঙ্গনে কে জানে গো।
হৃদয় আমার উদাস ক'রে
কেড়ে নিল আকাশ মোরে ;
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।

এই কবিতার মধ্যে যে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, কবি চিরঞ্জীব শর্ম্মার কবিতাটিতে তাহাই পরিস্ফুট। কিন্তু তথাপি এই দুটি কবিতা কি এক প্রকৃতির?— না—তাহা নয়!

একজন সীমার মধ্যে অসীমের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছেন, আর একজন সীমার মধ্যে অসীমের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন—উপভোগ করিতেছেন। একজনের নিকট সীমা-অসীমের লীলা যুক্তির দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, বাকি কেবল কবিতায় তাহাই ঘোষণা করা! আর একজনের নিকট সীমা-অসীমের লীলানুভূতির আনন্দ প্রকাশের রূপ চাহিতেছে।

রাম বড় ভাল ছেলে, তাহার মাতা পিতা তাহাকে যে কার্য্য করিতে বলেন, সে হাসিমুখে তাহা সম্পন্ন করে। এই উক্তিটির ভিতর দিয়া আমরা রামের প্রতি লেখকের কোন চিত্তবৃত্তিরই পরিচয় পাই না। রামের সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া তিনি যাহা অবগত হইয়াছেন, ইহা তাহারই বিবৃতি মাত্র। তিনি খোঁজ খবর লইয়া জানিয়াছেন, ছেলেটি এই এই করে এবং এই এই করে না। তাহার পর তিনি রাম নামক এই ছেলেটির সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হইলেন এবং তাহার সম্বন্ধে কিছু লিখিবার সময় কতক বা সে যাহা যাহা করে এবং কতক বা কল্পনায় তাহাকে দিয়া লেখক যাহা যাহা করাইয়া লইতে চান, সেই সকল সৎকর্ম্মের উল্লেখ করিয়া তাহার ভালছেলেত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা রাম নামক ছেলেটির ভালছেলেত্ব অতি সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু রাম নামক ছেলেটি সম্বন্ধে লেখকের কোন চিত্তবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় না। তেমনি চিরঞ্জীব শর্ম্মার উপরি উক্ত কবিতায় আমরা জানিতে পারি—ভগবান অনল, অনিল, চন্দ্র, সূর্য্য সকল স্থানেই আছেন। অর্থাৎ তিনি ভগবানের বাসস্থানগুলির একটি তালিকা কবিতার মারফতে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই। তিনি কেবল সৃষ্টির ভিতর দিয়া স্রষ্টার যে স্পর্শটুকু পাইয়াছেন তাহারই পুলকানন্দ কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা উপভোগ,—ইহা পথচলা—ইহা চলিতে চলিতে পথের আনন্দে গান গাওয়া।

ভগবান্ সম্বন্ধে কবিতা হইলেই তাহা অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক কবিতা হইয়া উঠে না। চাই ভগবান সম্বন্ধে কবির অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং কবিতার মধ্য দিয়া তাহারই প্রকাশ। একটা ফুল সম্বন্ধে কবিতা লিখিতে বসিয়াও কবি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আভাস দিতে পারেন, আবার ভগবান সম্বন্ধে কবিতা 'লিখিতে বসিয়াও আর একজন

কবি হয়ত একেবারেই অতি বড় স্থূল ভাব ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিলেন না। কবি ব্লেক্ সামান্য বালুকণার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিরহস্য দেখিয়া ফেলিলেন। আবার এমন কবিও আছেন যিনি সমস্ত সৃষ্টির মূলে বালুকণার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাহা হইলে দেখা গেল, বিষয়বস্তু সব সময় কবিতার প্রকৃতি নিরূপণ করে না। যাহার দৃষ্টিভঙ্গিটাই আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় তিনি ত বিষয়বস্তুর অপেক্ষা রাখিবেন না;—যাহা কিছু তিনি দেখিবেন, তাহার দেখার গুণে তাহাই আপনা হইতে রহস্যময় হইয়া উঠিবে;—তা সে তৃণগুচ্ছই হউক আর স্বয়ং ভগবানই হউন।

এই হিসাবে কবিতার প্রকৃতি নির্ণয়-ব্যাপার তাহার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে না,— নির্ভর করে কবি সেই বিষয়বস্তুটিকে কি ভাবে অনুভব বা উপভোগ করিয়াছেন তাহার উপর। কবিতার যদি শ্রেণী-বিভাগ করিতে হয় তাহা হইলে এই দিক দিয়া করিতে হইবে। এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যাইবে অনেক কবির ভগবৎকবিতা অতিবড় স্থূল এবং লৌকিক কবিতার সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে।

'জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি'—এই কবিতার বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, জাতি হিসাবে ইহা ঈশ্বরগুপ্তের সেই সকল কবিতার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে, যাহাদের মধ্যে গুপ্তকবি ঋতুগুলির রূপবর্ণনার ছলে সেই সেই ঋতুর লক্ষণগুলির তালিকা দিয়া গিয়াছেন। সে না হয় ঋতুর অস্তিত্বের লক্ষণগুলির তালিকা। আর এ না হয় ভগবৎ অস্তিত্বের লক্ষণগুলির তালিকা। আসল কথা এই দুই কবিতার একটির বিষয়বস্তু ভগবান এবং অপরটির বিষয়বস্তু ষড়ঋতু হইলেও ইহাদের ভিতর দিয়া কবি একই মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন,—একই দৃষ্টিভঙ্গি—একই out look। উভয়ই সমান স্থূল, সমান পার্থিব। রসের

জগতে স্থূল বা পার্থিব বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র জিনিষ নাই; আবার আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় বলিয়াও কোন স্বতন্ত্র জিনিষ নাই। কোন জিনিষ পার্থিব কি অতীন্দ্রিয়, তাহা মানুষের অনুভূতির উপর নির্ভর করে, এবং সেই অনুভূতির প্রকাশই কবিতা।

এই অবধি শুনিয়া অনেকে হয়ত বলিয়া উঠিবেন, উদাহরণস্বরূপ চিরঞ্জীব শর্ম্মা বা ঈশ্বর গুপ্তকে লইলে চলিবে কেন?—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিদের পদাবলীকে লইয়া বিচার করুন দেখি, দেখিতে পাইবেন রবীন্দ্রনাথের ভাব-ধারার সহিত এই সকল পদাবলীর অন্তর্নিহিত ভাবের কোন পার্থক্য নাই। অথচ বৈষ্ণব-কবিতা কেমন সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিরূপ জটিল, অস্পষ্ট এবং আবছা। ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই, রবীন্দ্র-নাথের কবিতা এবং বৈষ্ণবকবিতা এক প্রকৃতির নয়। উভয়ের বিষয়বস্তু হয় ত একই, এবং বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে হয় ত শেষ অবধি সেই একই তত্ত্বে আমরা পৌঁছাই—সেই একই সীমার মধ্যে অসীমের লীলা;—সে কিন্তু তত্ত্বের দিক হইতে—রসের দিক হইতে বা উপভোগের দিক হইতে নয়।

রসের দিক হইতে, উপভোগের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং বৈষ্ণবকবিদের কবিতার মধ্যে অনেক কিছু প্রভেদ। সেদিক হইতে এই দুই শ্রেণীর কবিতার প্রকৃতি এক জাতীয় নয়। বৈষ্ণবপদাবলী রচিত হইয়াছে বৈষ্ণবলীলাতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া। সুতরাং লীলাতত্ত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত সত্য। ব্যক্তিগত জীবনের সাধনার ভিতর দিয়াই হউক অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্ত সাধকগণের প্রবর্ত্তিত পথে চলিয়াই হউক ইঁহারা ভগবানের লীলাতত্ত্বটিকে মনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পর পদাবলী রচনা করিতে বসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা ইহার মধ্যে

কোথাও অস্পষ্টতা বা আবছায়ার লেশমাত্র পাইতেছেন না। রবীন্দ্রনাথের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহার নিকট সসীম এবং অসীমের এই লীলাতত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়—ইহা তাঁহার জীবনপথে চলিতে চলিতে ধীরে ধীরে, একটু একটু করিয়া সঞ্চয়-করা সত্য। তাই ইহা কোথাও কোন সুনির্দ্দিষ্ট রূপ লইতে পারে নাই—অথবা কবি ইহাকে কোন সুনির্দ্দিষ্ট রূপ দিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার নিকট এই লীলারহস্য অনন্ত-বিচিত্র। বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ দিতে গেলেই ইহার এই চির-বিচিত্র সূক্ষ্ম সুরটি রীতিমত স্থূল হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবকবিরা ভগবানকে একেবারে অন্তরঙ্গ ভাবে পাইতে চাহিয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহার ঐশ্বর্য্যের দিকে, তাঁহার মহিমার দিকে আদৌ নজর দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাহা করেন নাই, তিনি ভগবানকে তাঁহার মহিমামণ্ডিত অবস্থাতেই নিকটে পাইতে চান। তিনি চান ভগবান তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়াই এই ধূলার পৃথিবীতে নামিয়া আসুন। তাঁহাকে নিজের মতন করিয়া লইয়া তাঁহাকে কাছে আনিতে রবীন্দ্রনাথ চান নাই—তিনি তাঁর স্বরূপেই কবির নিকট আসিয়া ধরা দিন, ইহাই কবির মনোগত অভিপ্রায়।

বৈষ্ণবকবিরা পুত্ররূপী ভগবানকে ভোগ করিয়াছেন, বন্ধুরূপী ভগবানকে ভোগ করিয়াছেন, প্রিয়তমরূপী ভগবানকে ভোগ করিয়াছেন, তাহাতে যে ভগবান ছোট হইয়া গিয়াছেন তাহা নয়—কারণ ইহারা সকলেই, প্রতীক মাত্র। এই সকল প্রতীককে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা ভগবানকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের পশ্চাতে একটি সুনির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী কাজ করিতেছে। তাঁহারা যাহাই করুন না কেন, তাঁহাদের কেন্দ্র পূর্ব্ব হইতে ঠিক হইয়া রহিয়াছে। তাই তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় এত অধিক পরিমাণে

পার্থিব ভোগলিপ্সা আনিয়া ফেলিয়াও এতটুকু চিন্তিত হইয়া উঠেন নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কিন্তু এরূপ কোন বাঁধাধরা সুনির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালীর অস্তিত্ব নাই।

তিনি কাহারও প্রদর্শিত সাধন-পথ ধরিয়া চলেন নাই—নিজেই পথ চলিতে চলিতে এই লীলাতত্ত্ব জীবনের ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া লাভ করিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভগবান সুনির্দ্দিষ্ট কোনও সত্তা নন্—তিনি অনন্ত-বিচিত্র, চিরচঞ্চল। রবীন্দ্রনাথের নিকট মানবজীবন এবং সৃষ্টিও সুনির্দ্দিষ্ট নয়,—ইহারা চিরচঞ্চল, চিরগতিশীল, ইহাদের ধরিতে যাইলে আরও সরিয়া যায়।

এই যে অনন্ত-বিচিত্র সৃষ্টি, ইহার স্রষ্টাকে সুনির্দ্দিষ্ট কোনও প্রতীক দিয়া বাঁধিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত দ্বিধায়, কুণ্ঠায় ভরিয়া উঠে। তাই ভগবানকে কোন বিশিষ্ট রূপ দিবার পক্ষপাতী তিনি আদৌ নন্। তাই বৈষ্ণবকবিদের সহিত তিনি একথা বলিলেন বটে যে—

দয়া করে, ইচ্ছা করে আপনি ছোট হ'য়ে
এসো তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্য্য সুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,
জলে স্থলে দাও হে ধরা
কতো আকার লয়ে
বন্ধু হয়ে, পিতা হয়ে, জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোট হয়ে এস হৃদয়ে।

কিন্তু এইখানেই তিনি কবিতা শেষ করিলেন না। ইহার পর বলিলেন—

আমিও কি আপন হাতে
করবো ছোটো বিশ্বনাথে,
জানাবো আর জানবো তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে ?

—গীতাঞ্জলি

এইখানেই বৈষ্ণবকবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট। বৈষ্ণবকবিরা যে মাতা, পুত্র এবং বন্ধুর ভিতর দিয়া ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই ভগবান তাঁহাদের নিকট ছোট হইয়া ধরা দিয়াছেন একথা আদৌ সত্য নয়—যদিও বৈষ্ণবপদাবলীর ভিতর দিয়া আমরা ভগবানের লীলা অপেক্ষা নরনারীর পার্থিব লীলার কথাই বেশি করিয়া পাই. আসল কথা, বৈষ্ণবকবিরা আমাদের অতিবড় সুনির্দ্দিষ্ট পার্থিব সম্পর্কগুলির মধ্যে ভগবানকে সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন ; কেন না, যাহাদের জন্য তাঁহারা এই সকল পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের চারিদিকে বৈষ্ণবলীলাতত্ত্বের একটি আবহাওয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল, যাহার মধ্যে বাস করিয়া এই সকল পাঠক তাঁহাদের ভগবানটিকে এই সকল অতিবড় সুনির্দ্দিষ্ট পার্থিব সম্পর্ক বন্ধনের ভিতর হইতেও অনায়াসে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এরূপ কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত বা লীলাতত্ত্বের ভিত্তির উপর তাঁহার কবিতাকে দাঁড় করান নাই। তাই তাঁহার সর্ব্বদাই ভয়,—ভগবানকে যদি সুনির্দ্দিষ্ট কোন সম্পর্কের মধ্যে আনিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে ভগবান আর ভগবান থাকেন না, তাঁহার অসীমতা অনেকখানি নষ্ট হইয়া যায়।

আসল কথা, বৈষ্ণবকবিতার মধ্যে দুইটি দিক আছে, একটি তার রসের দিক, তার শিল্পের দিক, আর একটি তার তত্ত্বের দিক। এই

দুইটি দিককে বৈষ্ণবকবিরা আলাদা আলাদা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন রসের দিক হইতে বৈষ্ণবকবিতা একেবারেই পার্থিব ভোগের কবিতা, কিন্তু তত্ত্বের দিক হইতে বৈষ্ণবকবিতা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির কবিতা. বৈষ্ণবকবিতার এই দুইটি দিক স্বতন্ত্রভাবে রহিয়াছে। এই জন্য আমার মনে হয়, তত্ত্বকে বাদ দিয়া শুধু কেবল বৈষ্ণবপদাবলী আমরা যখন পড়ি, তখন আমরা যে আনন্দ পাই তাহা একেবারেই নিছক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পার্থিব সৌন্দর্য্যভোগের আনন্দ।

বৈষ্ণবদর্শন যুক্তি দিয়া প্রমাণ দিয়া ভগবানের লীলাতত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করিল। তাহাতে কোনই গোল বাধিল না; কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলী লিখিতে বসিয়া কবিরা মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। যুক্তি জিনিষটি আত্ম-সচেতন। কোনও একটি মত বা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার সময় মানুষ সব চেয়ে যে জিনিষটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলে, সেটি হচ্ছে তার প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই বৈষ্ণবদর্শন ভগবানকে আমার-তোমার মতই রক্তমাংসের মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াও আসল কথাটি ভুলিল না। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ যে মুহূর্ত্তে আমার-তোমার মত রক্তমাংসের মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই রীতিমত গোল বাধিল। ভগবান কবির নিকট সৃষ্ট-বস্তু। কবি ইঁহাকে রূপে, রসে গড়িয়া তুলিয়াছেন; কাজেই ভগবান যখন শিশু, তখন তিনি শিশুই—একেবারে পার্থিব শিশু;—ভগবান যখন প্রণয়ী তখন তিনি আমাদেরই মত প্রণয়ী,—অপার্থিব কিছুই নন্। শিল্পী যে মুহূর্ত্তে ভগবানকে রক্তমাংস দিয়া সৃষ্টি করিলেন সেই মুহূর্ত্তেই সৃজনের দরদ তাঁহাকে পাইয়া বসিবেই।

আসল কথা, পদাবলীসাহিত্য ভগবানকে মানুষের নিকটে আনে নাই—ভগবানকে মানুষ করিয়া সৃজন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে করিয়া ফল হইয়াছে এই, যে তত্ত্বকে বাদ দিয়া শুধু যখন বৈষ্ণবকবিতা

আমরা পড়ি তখন নরনারীর বিচিত্র লীলাই আমরা তাহার মধ্যে নানান ভাবে প্রত্যক্ষ করি।

শিল্পজগতে অতীন্দ্রিয়তার সৃষ্টি হয় ভিন্নধর্ম্মী দুটি ভাব বা বস্তুর সংঘাতে। মানুষের সহিত মানুষের, বস্তুর সহিত বস্তুর যে সংঘাত, তাহার মধ্যে অস্পষ্টতা কোথাও নাই। অপার্থিব দুটি ভাব বা বস্তুর সংঘাতের মধ্যেও অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ থাকে না। তাই তত্ত্বকে বাদ দিয়া স্বাধীনভাবে পড়িলে বৈষ্ণবকবিতার মধ্যে কোথাও অতীন্দ্রিয়তা নাই। বৈষ্ণব কবিতার কৃষ্ণ এবং গোপবালক প্রভৃতি তত্ত্বের দিক দিয়া যাহাই হউন না কেন, কাব্যের মধ্যে তাঁহাদের সংঘাত সমধর্ম্মী দুটি জীবের সংঘাত। আবার Paradise Lost এর চরিত্রগুলির সংঘাতের মধ্যেও কোথাও অতীন্দ্রিয়তা নাই, যদিও কবি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তাহারা কেহই পার্থিব জীব নয়। তাহার কারণ Paradise Lost এর অন্তর্গত জীবগুলি সকলেই অপার্থিব—সুতরাং সমধর্ম্মী। আসল কথা, অতীন্দ্রিয়তা আসিয়া পড়ে সেইখানে, যেখানে অসমধর্ম্মী দুটি সত্তার মধ্যে ভাব বিনিময় চলিতে থাকে। অতীন্দ্রিয়তা আসিয়া পড়ে সেইখানে, যেখানে মানুষ মানুষই থাকিয়া যায় এবং ভগবান ভগবানই থাকিয়া যান, অথচ দুজনে দুজনের মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে এই জিনিষটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতা এত রহস্যঘন, এত স্বপ্নময়, এত অতীন্দ্রিয়

রবীন্দ্রনাথের সহিত বৈষ্ণবকবিদের তফাৎ এইখানেই। বৈষ্ণব-কবিদের মত রবীন্দ্রনাথ পরমাত্মাকে অত নিকটে আনিতে চান নাই। বৈষ্ণবকবিদের মত তাঁহার লীলাতত্ত্ব ত কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমতকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে নাই যে ভগবানকে যত নিকটে আনুন না কেন, পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত এবং লীলাতত্ত্ব তাঁহার অসীমতার দিকটিকে

পূরণ করিয়া লইবে। বৈষ্ণবকবিরা যে, ভগবানকে অত নিকটে আনিতে সাহস করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহারা জানিতেন ভগবানকে কাব্যের ভিতর দিয়া তাঁহারা যত নিকটেই আনুন না কেন, তাঁহার আর একটা দিক পাঠকেরা পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসংস্কার বশে আপনা হইতে মনের মধ্যে ধারণা করিয়া লইতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাগবত-উপলব্ধির পশ্চাতে সেরূপ কোন পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত নাই। তাঁহার ধর্ম্মমত ত পূর্ব্ব হইতে গড়া জিনিষ নয়,—তাহা যে তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া একটু একটু করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই ত তিনি বলিয়াছেন—

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাবো কাহার দ্বার ?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের কবিতার পশ্চাতে স্বতন্ত্র কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত নাই, যাহার উপর ভগবানের আর এক দিকের উপলব্ধির বরাত দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে তাঁহাকে অতটা সীমাবদ্ধ করিয়া দেখাইতে পারেন। তাঁহার কবিতাই যে তাঁহার সব ;—সেইটুকুর মধ্যেই যে ভগবানকে একই সঙ্গে সসীম এবং অসীমরূপে দেখিতে হইবে। তাঁহাকে যে কবিতার মধ্য দিয়া দেখাইতে হইবে—"সীমার মধ্যে অসীম তুমি ..।" তাই বৈষ্ণবকবিদের মত রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে অত নিকটে আনিতে চান না। তিনি একটা ব্যবধান সর্ব্বদা রাখিতে চান. অসীম এবং সসীমের সেই সূক্ষ্ম সীমারেখাটি তিনি কিছুতেই মুছিয়া দিতে চান না, যাহা ইহাদিগকে সমধর্ম্মী হইয়া উঠিবার বিপদ হইতে অলক্ষিতে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই সূক্ষ্ম সীমারেখাটি মুছিয়া যাইলেই

অসীম এবং সসীম যে সমধর্ম্মী হইয়া উঠিবে, তাহাদের ঘাত প্রতিঘাত যে সমধর্ম্মী দুটি সত্তার ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া উঠিবে,—তাহাদের মধ্য দিয়া অতীন্দ্রিয় সুরটি যে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে না।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং বৈষ্ণবকবিদের কবিতার প্রকৃতি এক নয়। বৈষ্ণবকবিরা ভগবানকে মানুষরূপেই গড়িয়াছেন, তাই মানুষের মত তাঁহার চারিপাশে স্থান এবং কালের এত সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা। তাই তাঁর নিজের রূপও যেমন সুনির্দ্দিষ্ট—তাঁর চারিপাশের স্থানকালের রূপও তেমনি সুনির্দ্দিষ্ট। অনেকে বলেন, ঠিক এই জন্যই বৈষ্ণবকবিতা এত সরস এবং রসঘন হইয়া উঠিয়াছে আর রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় কবিতাগুলি এত 'ফিকে এবং জোলো' হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, রস জিনিষটি রূপকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, তাই অরূপকে যদি রসের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে রূপকে আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কথাটা একটু চিন্তা করিয়া দেখা যাক্। এ কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে রূপকে আশ্রয় না করিয়া রস কোন দিন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। রসের মূলে আছে রূপ। এই রূপকে বাদ দিয়া কোনও ভাব যখন আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে তখনই তাহা হইয়া উঠে তত্ত্ব। এই দিক হইতে অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় কবিতাগুলি তত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছে—রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই। এখন কথা উঠিতেছে, কাব্যের রূপবস্তু কি এবং তাহার সহিত কাব্যের সম্পর্ক কোন্ শ্রেণীর?

আমার মনে হয়, শিল্পকলার মধ্যে রূপ বলিয়া যে জিনিষটিকে আমরা নির্দ্দেশ করি তাহা একটি আপেক্ষিক জিনিষ। এক শ্রেণীর রসসৃষ্টির দিক হইতে যাহা রূপ, অপর শ্রেণীর রসসৃষ্টির দিক হইতে তাহা আদবেই

রূপ নয়। "এই রূপবস্তুর কোন বাঁধাধরা রূপ নাই। ধরুন্ কোনও চিত্রকর প্রভাতের বা দ্বিপ্রহরের একটি নিসর্গ-চিত্র আঁকিতেছেন,—সেখানে তিনি রংএর পর রংএর খেলা দেখাইবেন। সেখানে তিনি আকাশের রং, জলের রং, গাছপালার রং, মাঠের রং, কত রংই না আঁকিবেন। এখানে এই সকল রূপবস্তু চিত্রকরের রসপ্রকাশের সহায়তা করিতেছে। কিন্তু চিত্রকর যখন গভীর-রাত্রের কোন চিত্র আঁকিতে-ছেন, তখন এই সকল বিভিন্ন রূপ এবং রং যত কম থাকে, ততই তাঁহার চিত্রের ভিতরকার রসটি ফুটিয়া উঠে। সেখানে একমাত্র কালো রংই চিত্রকরের নিকট যথেষ্ট। অন্ধকার-রাত্রের বুকের মধ্যে যে সুরটি বাজিতেছে, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে যে রূপকে আশ্রয় করিতে হয়, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট কাটা ছাঁটা সুসীম রূপ নয়—তাহা অনির্দ্দিষ্ট, অসীম, রহস্যময় একটা রূপ। তাই চিত্রকর, সকল রং এবং রেখাকে আবৃত করিয়া ফেলিতে পারে যে কালো রং, তাহাই তাঁহার চিত্রের উপর এমন ঘন করিয়া লেপিয়া দিয়াছেন। অরূপকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে তাহার প্রকাশের রূপবস্তু যত অরূপঘেঁসা হয় ততই যে শিল্পীর সুবিধা।

আসল কথা, শিল্পজগতে রূপবস্তু বলিয়া স্বতন্ত্র কোন জিনিষ নাই ;—ভাববস্তুকে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে যাহা সহায়তা করে তাহাই রূপ। সুতরাং ভাববস্তুর অনুযায়ী রূপ আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে বাধ্য। তাই এক শ্রেণীর কবিতায় যাহা রূপ অপর শ্রেণীর কবিতায় তাহা রূপই নয়। রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে অরূপ একটি সত্তা ; সুতরাং তাহার রূপ স্থানকালপাত্রের সহায়তা যত কম লয়, ততই তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই রবীন্দ্রনাথের এই সকল কবিতার মধ্যে স্থানকালপাত্রকে কবি যতটা পারেন দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ'কথা অবশ্য ঠিক, যে কবি যাহাই লিখুন

না কেন, তাঁহাকে মানুষের ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে হয়; সুতরাং তাহার মধ্যে সীমাবদ্ধরূপ একেবারেই থাকিবে না, ইহা অসম্ভব। তাই যেটুকু সীমাকে আশ্রয় না করিলে মানুষেব ভাষায় কিছু ব্যক্ত করা যায় না, অতীন্দ্রিয় কবিতার শিল্পী সেইটুকুকে মাত্র অবলম্বন করিতে বাধ্য হন্।

এই শ্রেণীর অতীন্দ্রিয়-কবিতায় রেখা অপেক্ষা রংএর দিকেই কবি বেশি করিয়া ঝোঁক দিয়া থাকেন। কারণ রং হচ্ছে সঙ্গীতজাতীয় আর রেখা হচ্ছে চিত্রজাতীয় রং হচ্ছে অনির্দ্দিষ্ট রূপ আর রেখা হচ্ছে সুনির্দ্দিষ্ট রূপ। রেখার সুনির্দ্দিষ্ট রূপই কেবল একমাত্র রূপ, ইহাই যাহাদের ধারণা, তাঁহাদের মতে সঙ্গীতের মধ্যে কোন রূপই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সকল অতীন্দ্রিয়-কবিতা অনেকটা সঙ্গীতের সমজাতীয় জিনিষ। সঙ্গীতের মধ্যে যেমন কথার ভাগ যত কম থাকে তাহার প্রকাশ ততই সহজ হইয়া আসে, অতীন্দ্রিয়-কবিতার মধ্যেও ঠিক তেমনি সুনির্দ্দিষ্ট রূপের ভাগ যত কম থাকে ততই তাহার অতীন্দ্রিয়তা আপনাকে বেশি করিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারে। উচ্চ-সঙ্গীতের মধ্যে যে কারণে গায়ক যতটা পারেন বাক্যকে বাদ দিতে চান, অতীন্দ্রিয়-কবিতার কবি সেই কারণেই তাঁর কবিতার মধ্য হইতে সুনির্দ্দিষ্ট রূপকে যথাসম্ভব বাদ দিতে চেষ্টা করেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতীন্দ্রিয়-কবিতাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রূপকে এত করিয়া এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাই তিনি তাঁর ভগবানকে বিশেষ কোন রূপ দিতে চান নাই। তাই যেটুকু রূপকে আশ্রয় না করিলে নয় কেবলমাত্র সেইটুকু রূপকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন।

এই সকল অতীন্দ্রিয়-কবিতার মধ্যে কবি বলিতেছেন—কে যেন আসিতেছেন, কিন্তু তিনি যে ঠিক কে এবং তাঁহার রূপ যে কি তাহা কবি আমাদিগকে বলেন নাই—বলিতে চানও না। তাঁর কেবল মাঝে

মাঝে মনে হয়, কাহার অস্পষ্ট পদধ্বনি তিনি যেন মধ্যে মধ্যে শুনিতে পান। তিনি যে ঠিক কে তাহা কবি আমাদিগকে বলেন নাই—বলিবার ইচ্ছাও তাঁহার নাই। তিনি নিজেই যে এই চির-অপরিচিতের সমস্ত পরিচয় পান নাই এবং হয়ত বা তাহা পাইবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহও নাই। কেন না, এই কিছু জানা এবং অনেকখানি না জানার রহস্যই যে কবিকে মস্‌গুল্‌ করিয়া রাখিয়াছে। কবির ভগবান যে চিররহস্যময় ;—তাই কবির নিকট রহস্যময়তাই যে তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার রূপ।

কবি যতই বলুন না কেন—

তোমায় মোরা করবো বরণ
মুখের ঢাকা কর্‌বো হরণ
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।

আসলে কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে জানেন—সে পূর্ণবিকাশ সহ্য করিবার মত শক্তি তাঁহার নাই।

তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ
অনেক ব্যবধান,
দুঃখ সুখের অনেক বেড়া
ধন জন মান।

আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা—
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা।
শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার,
একেবারে সকল পর্দা
ঘুচায়ে দাও তার।
না রাখো তার ঘরের আড়াল
না রাখো তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায়
করো অকিঞ্চন।
না থাকে তার মান অপমান,
লজ্জা সরম ভয়;
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্ব ভুবনময়।
এমন করে মুখোমুখি
সাম্‌নে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই॥

এই যে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন না—ইহার জন্য তাঁর এতটুকু দুঃখ নাই; তাই কবিতাটির মধ্যেও আমরা এতটুকু বেদনার সুর পাই না। কবিতাটির মধ্যে আমরা পাই কেবল চিন্তার একটা বিবৃতিমাত্র—ইহার মধ্যে অনুভূতির সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। আসল কথা, কবি যুক্তি করিয়া, বিচার করিয়া, চিন্তা করিয়া, যাহাই চান না কেন,—রসের দিক দিয়া, অনুভূতির দিক দিয়া তিনি সেই 'আড়াল দিয়ে লুকিয়ে যাওয়া' চিররহস্যময় ভগবানকেই অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়া উপভোগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মনের ধাতই যে এইরূপ। তাই যেখানেই তিনি আড়াল হইতে আভাসে, ইঙ্গিতে তাঁর ভগবানের 'চলে যাওয়ার শব্দটুকু' হঠাৎ শুনিয়া ফেলিয়াছেন, সেইখানেই তাঁর কবিতা অনুভূতি ও বেদনায় অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

তাই কবির ঈপ্সিততম যখনই আসিয়াছেন, একটি মেঘাবরণ দিয়া নিজের পরিপূর্ণ বিকাশকে অনেকখানি নিষ্প্রভ করিয়া অসিয়াছেন। তাই কবি পূর্ণ-জাগ্রৎ অবস্থায় তাঁর ঈপ্সিততমের দেখা কোন দিন পান নাই। তিনি তাঁর আগমন সংবাদ পাইয়াছেন হয় ঘুমঘোরে, না হয় তিনি চলিয়া যাইবার পর তাঁর 'চলে যাবার শব্দ শুনে'।

কোথাও বা কবি বলিতেছেন—

এলো যখন সাড়াটি নাই,
গেল চলে জানাল তাই।

—গীতাঞ্জলি।—

কোথাও বা বলিতেছেন—

তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙলো রে ঘুম অন্ধকারে।

আবার কোথাও বা বলিতেছেন—

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে গেছে হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে॥

কখনও বা বলিতেছেন—

সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণবরণ পারিজাত লয়ে হাতে।
*　*　*　*
কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি,
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে
দেখা বুঝি আর হোল না তোমার সাথে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে॥

এমনি করিয়া কবি কোথাও তাঁর ঈপ্সিততমকে খুব নিকটে আনিতে চান নাই। তাঁর ঈপ্সিততম যে অশেষ, তাঁর যে শেষ নাই, তিনি যে অসীম—অনন্ত। এই জীবনও যেমন অশেষ, এই সৃষ্টিও যেমন অশেষ, তিনিও তেমনি অশেষ, অনন্ত। কবি যে তাঁহাকে একটু একটু করিয়া ধীরে ধীরে পাইতেছেন এবং জীবনের পর জীবন অতিবাহিত করিয়া তিলে তিলে তাঁহাকে পাইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে শেষ কথা তিনি কেমন করিয়া বলিবেন।

তাই কবি বলিতেছেন—

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠবে জীবন ভরে।
জানি জানি আমার চেনা
কোনো কালেই ফুরাবে না.
চিহ্ন-হারা পথে আমায়
টানবে অচিন-ডোরে।

এই যে অপরিচয়ের রহস্য, এই যে অনন্ত পথচলার মাদকতা, ইহা কবিকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। আমার মনে হয় এইখানেই রবীন্দ্রনাথের রসসাধনার মূল। কবির যত কিছু আনন্দ এইখানেই।

চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া কবি হয়ত ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে উঠিবার প্রয়াসী হইতে পারেন, কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর অনুভূতির জিনিষ নয়। এইখানেই আমরা শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে পাই। শিল্পীর নিকট বড় ছোট বলিয়া কোন জিনিষ নাই। তিনি যেটাকে যখন অনুভব করেন সেইটাই তাঁর কাছে তখন সবচেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়। কবি ভোগ করিতেছেন লীলারহস্যের অপূর্ব্বতা ;—তাই কবির নিকট তাহাই সবচেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই কবির মনে হইতেছে, এ লীলা যেন কোন দিন শেষ না হয়। তাই কবি শেষ চান না—তিনি চান অনন্ত লীলা।

শেষ নাহি যে
শেষ কথা কে বলবে ?
আঘাত হয়ে দেখা দিলো,
আগুন হয়ে জ্বলবে।

সাঙ্গ হলে মেঘের পালা,
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা;
বরফ জমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে

তাই কবি অন্যত্র আবার বলিতেছেন—

সেই তো আমি চাই,
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।

তাই আবার অপর একটি কবিতায় বলিতেছেন—

আমারে তুমি অশেষ করেছো
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেচো
জীবন নব নব।

আবার অন্যত্র তিনি বলিতেছেন—

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর,
যবে আমার জীবন হবে ভোর।
চলে যাবো নব জীবন-লোকে,
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরবো তব নব মিলন ডোর
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

এ সকল কথা আমরা মোটামুটি এক রকম বুঝিলাম ; এগুলি কবির মনের কথা,—চিন্তার কথা। কিন্তু কবির মনের ধারণা বা চিন্তাই ত আর কবিতা নয়। এই চিন্তা, এই ধারণাগুলিকে কবি কতটা রসরূপ দিতে পারিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

আমার মনে হয়, শিল্পের দিক হইতে, রসের দিক হইতে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির সবগুলি কবিতা শ্রেষ্ঠ রচনা হইয়া উঠিতে পারে নাই ; কবিতা জিনিষটি অনুভূতির প্রকাশ—চিন্তার প্রকাশ নয় ; তাই কবি যে সকল কবিতার মধ্যে অরূপকে অনুভব করিয়াছেন বা উপভোগ করিয়াছেন সেই কবিতাগুলিই রসসৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁর মনের ধারণা এবং চিন্তাগুলিকে শুধু ছন্দে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন মাত্র, সেখানে তাঁহার কবিতা কোন মতেই প্রথম শ্রেণীর রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

ধরুন নিম্নলিখিত কবিতাটি আমরা পড়িলাম—

শেষ নাহি যে,
শেষ কথা কে ব'লবে ?
আঘাত হয়ে দেখা দিলো
আগুন হয়ে জ্ব'লবে।
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে
নদী হয়ে গ'লবে।
ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে,

অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠ্‌বে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে
মরণে ফল ফ'লবে॥

—গীতালি।

ইহার মধ্যে আমরা পাই কবির একটি মানসিক ধারণা বা চিন্তার হুবহু ভাষা-প্রতিকৃতি। সৃষ্টিলীলা যে কোনদিন শেষ হইয়া যাইবে না—ফুরাইয়া যাইবে না, কবি তাহাই গুছাইয়া, সুন্দর করিয়া, নানান উদাহরণ দিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। ইহাকে আমরা ঠিক রসসৃষ্টি বলিতে পারি না: লীলা কখন শেষ হইয়া যাইবে না, ইহা চিন্তার কথা, ইহা একটি তত্ত্ব। কিন্তু সৃষ্টিলীলার এই শেষ না হওয়ার রহস্যটিকে অনুভব এবং উপভোগ করার মধ্যে আছে রস-প্রেরণা।

উপরিউক্ত কবিতাটির মধ্যে কবি কোথাও লীলার এই অনন্ত রহস্যটীকে উপভোগ করিতেছেন না—তিনি ইহাকে বিবৃত করিতেছেন মাত্র। তাই এই কবিতাকে আমরা প্রথম শ্রেণীর রসসৃষ্টি বলিতে পারি না। ইহার মধ্যে আমরা গুছাইয়া বলার শক্তির পরিচয় পাই বটে কিন্তু কবির প্রাণের সে গভীর অনুভূতি এবং দরদ পাই না, যাহা তাঁর বক্তব্যকে রসমূর্ত্তি দান করিতে পারে।

তাই যেখানে কবি বলিতেছেন—

বেসুর বাজেরে
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন মাঝেরে;

মেলে না সুর এই প্রভাতে
আনন্দিত আলোর সাথে,
সবারে সে আড়াল করে,
মরি লাজেতে॥

সেখানে আমরা রসের সন্ধান যে একেবারেই পাই না তাহা নয়, কিন্তু ততটা নয় যতটা পাই তাঁরই নিম্নলিখিত গানের মধ্যে—

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে
এমন গানে গানে .
কেন তারার মালা গাঁথা
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে ;
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে।

উভয় কবিতার মধ্যে বক্তব্যবিষয় প্রায় একই। উভয় কবিতার মধ্যেই কবি বলিতে চাহিয়াছেন,—সৃষ্টির এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের সহিত যদি তাঁহার চিত্তের প্রেমের বন্ধন না হইয়া থাকে ; সৃষ্টির অখণ্ড সুরের সহিত যদি তাঁহার চিত্তবীণা সুর মিলাইয়া লইতে না পারে, তবে তাঁহার জীবনই বৃথা। কিন্তু পরবর্ত্তী কবিতাটিতে কবির মনের এই বেদনার সুরটি কি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে! আগেকার কবিতাটির মধ্যে আমরা পাই কবির এই মানসিক দুঃখের বিবৃতির রূপ, কিন্তু শেষের কবিতাটিতে আমরা পাই কবির প্রাণের এই বেদনাটির অনুভূতির রূপ।

এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির মধ্যে একদিকে যেমন অনেকগুলি

প্রথম শ্রেণীর অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি আমরা পাই, অপর দিকে তেমনি এমন অনেক কবিতাও পাই যেগুলি রসসৃষ্টি হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য নয়।

এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে একদিকে যেমন—

আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধুহে আমার।

—গীতাঞ্জলি

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে ;
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে।

—গীতাঞ্জলি

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

—গীতাঞ্জলি

এসো হে এসো সজল ঘন
বাদল বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে জীবনে।

—গীতাঞ্জলি

সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।

—গীতাঞ্জলি

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধূলো যত ?

—গীতিমাল্য

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে।

—গীতিমাল্য

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ ক'রে গেছো হেসে।

—গীতিমাল্য

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে
এমন গানে গানে।

—গীতিমাল্য

তার অন্ত নাই গো
যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।

—গীতিমাল্য

এইতো তোমার আলোক ধেনু
সূর্য্য তারা দলে দলে

কোথায় ব'সে বাজাও বেণু
চরাও মহাগগনতলে।
—গীতিমাল্য

মালা হ'তে খ'সে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও।
—গীতালি

শুধু তোমার বাণী নয় গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
—গীতালি

আমি যে আর সইতে পারি নে
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারি নে।
—গীতালি

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে?
—গীতালি

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এলো মোর অঙ্গনে কে জানে গো।
—গীতালি

সন্ধ্যা হ'লে একলা আছি ব'লে
এই যে চোখে অশ্রু পড়ে গ'লে,
ওগো বন্ধু, বলো দেখি
শুধু কেবল আমার একি ?
এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে।

—গীতালি

ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোনার অলঙ্কার।

—গীতালি

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে

—গীতালি

—প্রভৃতি অপূর্ব্ব কবিতাগুলি আমরা পাই, অপর দিকে তেমনি আবার—

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।

—গীতালি

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা।

—গীতাঞ্জলি

তারা তোমার নামের বাটের মাঝে
মাশুল লয় যে ধরি।

—গীতাঞ্জলি

আর আমায় আমি নিজের শিরে
বইবো না।
—গীতাঞ্জলি

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি।
—গীতিমাল্য

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাবো কাহার দ্বার ?
—গীতিমাল্য

তোমার কাছে শান্তি চাবো না।
থাক্‌না আমার দুঃখ ভাবনা।
—গীতিমাল্য

বাধা দিলে বাধবে লড়াই
মরতে হবে।
—গীতালি

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
—গীতালি

শেষ নাই যে
শেষ কথা কে বলবে ?
—গীতালি

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?
—গীতালি

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন সহজ হবি।
—গীতালি

সেই তো আমি চাই
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
—গীতালি

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
—গীতালি

—প্রভৃতি এমন অনেক কবিতা পাই, যেগুলি রসসৃষ্টি হিসাবে বিশেষ উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য নহে।

অন্য দিক হইতে এই সকল কবিতার হয়ত বা কিছু মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু রসসৃষ্টিহিসাবে ইহাদের বিশেষ কোন মূল্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করিতেছি, এবং সেই উপলব্ধির আনন্দ বা বেদনাটিকে ভাষায় এবং ছন্দে ব্যক্ত করিতেছি, ইহা কবিতা। কিন্তু সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করিবার পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের হাত হইতে মুক্তি পাইতে

হইলে নিজেকে কি ভাবে তৈরী করিয়া তুলিতে হয়, ছন্দের সাহায্যে তাহা ব্যক্ত করিয়া কোনদিনই প্রথম শ্রেণীর রসসৃষ্টি করা যায় না।

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?

অথবা—

সহজ হ'বি সহজ হ'বি
ওরে মন, সহজ হ'বি।
কাছের জিনিষ দূরে রাখে,
তার থেকে তুই দূরে র'বি॥

অথবা—

বাধা দিলে বাধবে লড়াই
মরতে হবে।

এই সকল পদকে ঠিক রসসৃষ্টি বলিতে পারা যায় না। সাধন-পথের এই সকল বাধাবিঘ্নকে লইয়া যে রসসৃষ্টি হইতে পারে না, এমন নয়,—কিন্তু এভাবে নয়। এই সকল বাধাবিঘ্নকে এড়াইয়া চলিতে হইবে, বা এই সকল বাধাবিঘ্ন সাধন-পথে প্রায়ই আসিয়া দেখা দেয়, একথা আমরা কোন দিন কবির নিকট শুনিতে চাই না। এই সকল বাধা-বিঘ্ন পদে পদে আসিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতেছে,—কবিকে তাঁর ঈপ্সিততমের পানে অগ্রসর হইতে দিতেছে না—ইহারই বেদনাটুকু, ইহারই কাতরতাটুকু আমরা কবির কবিতার মধ্যে পাইতে চাই। এই বেদনাটুকু, এই কাতরতাটুকুই রস। ইহাকে বাদ দিয়া যখন আমরা সাধনপথের এই সকল বাধাবিঘ্নকে পাঠকের চোখের সামনে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করি, তখন তাহা হইয়া উঠে নৈতিক উপদেশ।

জীবনকে আজ তোল্ জাগিয়ে,
মাঝে সবার আয় আগিয়ে,
চলিস্ নে পথ মেপে মেপে,
আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে,
যে টুকু দিন বাকি আছে
কাটাস্‌নে তা ঘুমের ঘোরে।

—গীতিমাল্য

অথবা

সকল দাবী ছাড়বি যখন
পাওয়া সহজ হবে।
এই কথাটি মনকে বোঝাই,
বুঝবে অবোধ কবে ?

—গীতিমাল্য

অথবা—

নারে তোদের ফিরতে দেবো নারে
মরণ যেথায় লুকিয়ে বেড়ায়
সেই আরামের দ্বারে
চল্‌তে হবে সাম্‌নে সোজা
ফেল্‌তে হবে মিথ্যা বোঝা,
টল্‌তে আমি দেবো না যে
আপন ব্যথার ভারে।

—গীতালি

—প্রভৃতি কবিতাকে আমরা নৈতিক কবিতা বলিতে পারি। কবি রামপ্রসাদের—

মন, তুমি কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন্ রইলো পতিত,
আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোণা॥
ইত্যাদি

অথবা—

তাই বলি মন জেগে থাক,
পাছে আছেরে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর।
ইত্যাদি

অথবা—

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমায় বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না॥

অথবা সাধক কবি কমলাকান্তের—

মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বলে,
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে।
ইত্যাদি

—প্রভৃতি গানের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গানের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গির যতই পার্থক্য থাকুক না কেন,—ইহারা একই প্রকৃতির কবিতা। এই সকল নৈতিক কবিতার মধ্যে সাধকের ব্যক্তিগত

অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় না,—পাওয়া যায় তাঁহার সাধন-পথের গোটাকতক অভিজ্ঞতার বিবৃতি মাত্র। সাধক-কবির সাধন-পথে যে সকল ঐহিক বস্তু বা ঘটনা বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহাই বার বার গানের ভিতর দিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি নিজেকে এবং পাঠকগণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। এই যে নিজেকে বা পাঠকগণকে সাবধান করাইয়া দেওয়া—ইহা রসিক বা কবির কাজ নয়। এ মনোবৃত্তি রসিকের মনোবৃত্তি নয়। রসিকের কাজ রসপরিবেষণ, এবং এই রসের উৎসমূল অনুভূতি। অথচ এই সকল নৈতিক কবিতার মধ্যে এই অনুভূতি জিনিষটিরই একান্ত অভাব। তাই এই সকল নৈতিক কবিতা কোনদিন শ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে না। অভিজ্ঞতার প্রকাশ ত কবিতা নয়—অনুভূতির প্রকাশই কবিতা।

সাধক-জীবনের এইসকল অভিজ্ঞতাকে উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যে প্রথম শ্রেণীর কবিতা গড়িয়া উঠিতে পারে না, এমন নয়। এই সকল বাধাবিঘ্ন সাধকের জীবনে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে, তাহারি বেদনাটুকু সাধক-কবি যদি ছন্দে প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা অনায়াসে উচ্চশ্রেণীর রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সাধক-কবি রামপ্রসাদেরই দুইটি গান পাশাপাশি উল্লেখ করা যায়—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা॥
কালীনামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্ত-কেশীর শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥

ইত্যাদি

এই গানটির মধ্যে অনুভূতির কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। কবি তাঁর সাধক-জীবনের ভিতর দিয়া যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে জানাইতেছেন মাত্র। ইহা তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবৃতি মাত্র,—অনুভূতির প্রকাশ নয়।

কিন্তু—

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়
ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত?
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি
দেখি আমি অভয় পদ॥

ইহাকে রসসৃষ্টি না বলিয়া থাকা যায় না। ইহার মধ্যে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে উপদেশ নাই,—আছে গভীর অনুভূতি। সংসারের যে সকল বাধা-বিঘ্ন তাঁহার সাধন-পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কবি আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন না;—সেই বিঘ্নগুলি তাঁর সাধক-জীবনের সমস্ত শান্তি, সমস্ত সাফল্য কেমন করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে,

তাহারই গভীর নৈরাশ্যটুকু, তাহারই নিবিড় বেদনাটুকু গানটির ভিতর দিয়া কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাধন-গীতিগুলির মধ্যেও এইরূপ দুই শ্রেণীর কবিতা পাওয়া যায়। তাঁহার এই সকল সাধন-সঙ্গীতের মধ্যে এক শ্রেণীর কবিতা আছে, যে গুলি জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিবৃতি মাত্র—

যেমন—

সহজ হ'বি সহজ হ'বি
ওরে মন সহজ হ'বি।
কাছের জিনিষ দূরে রাখে,
তার থেকে তুই দূরে র'বি
ইত্যাদি

কিন্তু আর একশ্রেণীর সাধন-গীতি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির মধ্যে পাওয়া যায়, যেগুলিব মধ্যে জীবনের এই সকল অভিজ্ঞতা কাজ করিতেছে বটে, কিন্তু ও ভাবে নয়। সেখানে এই সকল অভিজ্ঞতা কবির অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছিয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। সেগুলি এখন আর বাহিরের অভিজ্ঞতা মাত্র নয়,—তাহারা এখন জীবনেরই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়া কবির ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

যেমন—

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জানো মন তোমারে চায়॥

ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়
তুমি জানো, মন তোমারে চায়।
ইত্যাদি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'খেয়া' পর্য্যন্ত আসিয়া কবি রূপ-জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। তাহার পর 'গীতাঞ্জলির' মধ্যে রূপজগতের কথা সামান্যভাবে দু-একটি কবিতায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 'গীতিমাল্য' এবং বিশেষ করিয়া 'গীতালির' মধ্যে রূপ-জগতের কোন চিহ্নই প্রায় পাওয়া যায় না। ইহার পর 'বলাকার' মধ্যে কবি আবার একটু একটু করিয়া রূপ-জগতে ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু আসিবার সময় অরূপ-লোকের অনেকখানি আবহাওয়া তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। তিনি রূপ-জগতে ফিরিয়া আসিলেও অরূপের দেশে এতকাল বাস করার ফলে রূপ-জগৎ আর তাঁহাকে ঠিক পূর্ব্বের মত রূপ-রস শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়া মুগ্ধ করিতেছে না।

'সোনার তরীর' সময় হইতে এই সৃষ্টি কবিকে মুগ্ধ করিত তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যের দ্বারা। তাহার পর 'খেয়া' পর্য্যন্ত এই রূপ-জগতকে উপভোগ করিয়া কবি চলিয়া গেলেন অরূপের দেশে। অতঃপর 'বলাকার' মধ্যে কবি আবার রূপ-জগতে ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু পূর্ব্বের সে মন লইয়া নয়। সেই একই রূপ-জগৎ আজিও তেমনি করিয়া তাহার অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভার সাজাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অরূপের দেশ হইতে প্রত্যাগত কবির চোখে তখনও স্বপ্ন ঘোর লাগিয়া রহিয়াছে,—রূপ-জগতের প্রত্যক্ষ-সৌন্দর্য্য তাঁহাকে পূর্ব্বের মত মুগ্ধ করিতে পারিতেছে না।

বোধ হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যৌবনান্তের সঙ্গে সঙ্গে যখন শিথিল হইয়া আসে—নিস্তেজ হইয়া আসে, তখন রূপ-জগতের প্রত্যক্ষ-সৌন্দর্য্য আমাদিগকে ঠিক পূর্ব্বের মত করিয়া মুগ্ধ করিতে পারে না। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির আনন্দ অপেক্ষা চিন্তার আনন্দই আমাদের মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠে। অবশ্য এ সত্যটি যে কেবল চিন্তাশীল শিল্পীদের সম্বন্ধেই খাটে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই;—কেন না, বার্দ্ধক্য বাহির হইতে ত চিন্তাশীলতাকে আনিয়া দিতে পারে না। বার্দ্ধক্য, চিন্তাশীলতার সৃষ্টি করে না,—যে শিল্পীর মধ্যে চিন্তাশীলতা পূর্ব্ব হইতে ছিল, বার্দ্ধক্যের প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলি নিস্তেজ হইয়া পড়াতে সেই অন্তর্নিহিত চিন্তাশীলতা আপনা হইতে প্রকট হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, চিন্তাশীল শিল্পী বৃদ্ধ বয়সে তাঁর শিল্পিত্ব হারাইয়া একেবারে নিছক চিন্তাশীল হইয়া উঠেন!—আদৌ তাহা নয়। সাধারণতঃ যাঁহাদিগকে আমরা চিন্তাশীল বলিয়া থাকি, তাঁহারা চিন্তা করেন চিন্তার বিলাসের জন্য নয়,—তাঁহারা চিন্তা করেন বিশেষ এবং নির্দ্দিষ্ট একটি সমাধানে আসিয়া পৌছিবার জন্য। তাই তাঁহাদের চিন্তাখণ্ডগুলি এমন ভাবে পর পর সাজান থাকে, যাহাতে তাহারা আপনা হইতে একটি মীমাংসায় আসিয়া পৌছিতে পারে। এখানে চিন্তাটা পথমাত্র, মূল উদ্দেশ্য কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সত্যে গিয়া পৌছান। এককথায়, চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তাকে কোন দিন উপভোগ করেন না—তিনি উপভোগ করেন চিন্তা-প্রসূত সত্যকে। চিন্তাশীল কবি বা শিল্পীর চিন্তা কিন্তু অন্য প্রকৃতির; তিনি এই চিন্তাটাকেই উপভোগ করেন। তিনি চিন্তা করেন চিন্তা করিতে ভাল লাগে বলিয়া। আমরা যে জিনিষকে ভালবাসি, তাহাকে নিজের পছন্দমত রূপ দিতে চাই।—তাহা না হইলে তাহাকে নিবিড় ভাবে, অন্তরঙ্গভাবে উপভোগ করা যায় না। তাই চিন্তাশীল কবির চিন্তা

কোন একটি নির্দ্দিষ্ট রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এবং এই রূপবান চিন্তাই পরে কবিতা হইয়া দেখা দেয়। ধরুন, কোন ব্যক্তি চিন্তা করিতেছেন, সৃষ্টিটা স্থিতিশীল কি গতিশীল? এ চিন্তা তাঁহার নিজের মনে আপনা হইতে জাগিতে পারে, অথবা অন্য কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রবন্ধাদি পড়িয়াও মনের মধ্যে উদিত হইতে পারে। তার পর, ধরিয়া লউন, উক্ত ব্যক্তি নিজের জ্ঞান এবং যুক্তির সাহায্যে, অথবা অন্য কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির যুক্তি-প্রণালী অনুসরণ করিয়া শেষকালে স্থির করিয়া ফেলিলেন,—সৃষ্টিটা স্থিতিশীল নয়—গতিশীল। যে ব্যক্তি শুধুই চিন্তাশীল তাঁহার কাজ ঐখানেই শেষ হইল; অথবা অন্য আর একটি স্বতন্ত্র চিন্তা উহা হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহাকে আবার নূতন করিয়া চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। চিন্তাশীল কবি কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত আসিয়াই, অর্থাৎ সৃষ্টিটা গতিশীল, ইহা স্থির করিয়া ফেলিয়াই হাঁফ ছাড়িতে পারিলেন না, বরং ইহার পর তাঁর প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইল। চিন্তা করিয়া, অথবা অন্যের চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া তিনি যে সত্যে উপনীত হইলেন, তাহা তখন তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিল। কবি তখন এই সত্যটিকে রসবস্তু করিয়া তুলিয়া ইহাকে উপভোগ করিতে বসিলেন। সৃষ্টির এই গতিশীলতা তখন তাঁহাকে মুগ্ধ করিল—চমৎকৃত করিল, তাঁহার মধ্যে একটা রহস্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিল। এই গতিশীলতা তখন চিন্তার স্তর ছাড়িয়া, রূপান্তরিত হইয়া অনুভূতির স্তরে আসিয়া পৌঁছিল। এই অনুভূতি তখন যে প্রকাশ চাহিল, তাহা যুক্তিপরম্পরা নয়—তাহা রূপাভিব্যক্তি। ধরুন, আমি যুক্তির দ্বারা এই সত্যে আসিয়া উপনীত হইলাম, যে সৃষ্টিটা গতিশীল। এই যে আমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য,—ইহাকে প্রকাশ করিবার সময় শুধু কেবল যদি বলি যে, সৃষ্টি গতিশীল, তাহা হইলে কেহই তাহা শুনিবে না। তখন যে

যুক্তিপ্রণালী অনুসরণ করিয়া এই সত্যটিতে আমি উপনীত হইয়াছি, তাহা আমাকে বিবৃত করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যায়, চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তা যখন প্রকাশের রূপ গ্রহণ করে, তখন তাহা হইয়া উঠে যুক্তিশৃঙ্খলা। চিন্তাশীল কবির নিকট কিন্তু সত্যে পৌঁছানটাই শেষ কাজ নয়—তাঁহার আসল কাজ এই সত্যটিকে অনুভব করা, তাহার সহিত রসসম্বন্ধ স্থাপন করা। সুতরাং কি উপায়ে তিনি উক্ত সত্যে উপনীত হইতে পারিয়াছেন, তাহা জানিবার এবং জানাইবার জন্য তাঁহার এতটুকুও আগ্রহ নাই।

এই সকল যুক্তিখণ্ড যে মুহূর্তে কবির মনের মধ্যে একটি অনুভূতির সৃষ্টি করিল, অমনি তাহাদের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। কবি তখন এই সকল যুক্তি এবং চিন্তাপরম্পরাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া তাহাদের দ্বারা আহৃত সত্যটিকে উপভোগ করিতে বসিয়া যান্। এই সত্য তখন আর তাঁহার নিকট তত্ত্বমাত্র নয়—তখন তাহা কবির নিকট হইয়া উঠে প্রত্যক্ষ একটি ঘটনা—যাহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবস্তুর মতই রূপে, রসে, শব্দে গন্ধে, স্পর্শে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে উপভোগ করা যায়। অশরীরী একটি তত্ত্বকে চিন্তা করা যায়—কিন্তু উপভোগ করিতে গেলে চাই শরীরী রূপ।—আসল কথা, যৌবনে কবির বহিরিন্দ্রিয়গুলি যেমন বহির্জগৎ হইতে তাঁহার উপভোগের বিষয়বস্তুগুলিকে আহরণ করিয়া আনিত, বৃদ্ধ বয়সে সেইগুলিকে আহরণ করিতেছে কবির অন্তরিন্দ্রিয়গুলি। ইহার দ্বারা যে কেবল আহরণের রীতিরই প্রভেদ ঘটিয়াছে মাত্র, তাহা নয়—ইহার দ্বারা আহৃত বিষয়বস্তুর প্রকৃতিতেও যথেষ্ট বৈষম্য ঘটিয়াছে। কেন না, বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু আর অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু কখনই এক হইতে পারে না। বহিরিন্দ্রিয় কবির উপভোগের জন্য তাঁহার অনুভূতির রাজ্যে যে বিষয়বস্তু বহন করিয়া আনিত, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগতের

জিনিষ, তাহা বস্তু, তাহা বাস্তব ঘটনা, তাহা শরীরী স্পষ্টপদার্থ। আর অন্তরিন্দ্রিয় আজ কবির উপভোগের জন্য যে বিষয়বস্তু বহন করিয়া আনিতেছে, তাহা মনোগ্রাহ্য তত্ত্ববস্তু, তাহা চিন্তাপ্রসূত অশরীরী ভাব বা সত্য। সুতরাং কবি যৌবনে যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের বিষয়বস্তু, আর আজ তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিতেছেন, তাহাদের বিষয়বস্তু এক না হওয়ারই কথা। কিন্তু বিষয়বস্তুর এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া কেহ যেন মনে না করেন, কবির অনুভূতির কোন তারতম্য হইয়াছে।—আদৌ তাহা নয়!—তফাৎ হইয়াছে কেবল অনুভূতির বিষয়-বস্তুতে —অনুভূতিতে নয়।

যে প্রগাঢ়,গভীর অনুভূতি লইয়া কবি একদিন বহির্জগতকে উপভোগ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই একই অনুভূতি আমরা তাঁহার এই সকল তত্ত্ববস্তুর উপভোগের মূলে পাই। শুধু তাহাই নয়।—এই সকল তত্ত্বকে কবি যখন উপভোগ করিতেছেন, তখন তাহারা কবির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, বিষয়বস্তু বাহ্যজগতের কোন প্রত্যক্ষ বস্তুই হৌক বা মনোরাজ্যের কোন অশরীরী তত্ত্ব বস্তুই হৌক এবং তাহার সংগ্রাহক হিসাবে আমরা বহিরিন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয় যাহাকেই পাই না কেন,—কবি যখন তাহাকে উপভোগ করিতেছেন, তখন তাহাকে ইন্দ্রিয় দিয়াই উপভোগ করিতেছেন—যেমন করিয়া কবি একদিন উপভোগ করিয়াছিলেন বহির্জগৎকে। অর্থাৎ, বিষয়বস্তু শরীরী কোন রূপবস্তুই হউক আর অশরীরী কোন তত্ত্ববস্তুই হউক, কবি যখন ইহাকে উপভোগ করেন, তখন তাহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তুতে পরিণত করিয়া তুলিয়া তবে উপভোগ করেন। এখন দেখা যাক্, কবি তাঁর তত্ত্ববস্তুটিকে কি ভাবে রূপবান করিয়া তুলেন।

অশরীরী একটি তত্ত্বকে কবি দুই ভাবে রূপবান করিয়া তুলিতে

পারেন :—অশরীরী এই তত্ত্বটিকে সুনির্দ্দিষ্ট, পরিচিত, সমধর্ম্মী একটি শরীরী রূপের মধ্যে ফেলিয়া, অথবা এমন একটি সমধর্ম্মী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া, যাহার মধ্যে এই তত্ত্বটি সহজেই আপনা হইতে রূপবান হইয়া উঠিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' হইতেই দুইটি কবিতাকে উদাহরণ স্বরূপ ধরিয়া কথাটাকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। 'বলাকার' মধ্যে আমরা 'চঞ্চলা' বলিয়া একটি কবিতা পাই। কবিতাটির কতকাংশ নিম্নে দিলাম—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে ;
ঘূর্ণ্যচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্বুদের মতো।
হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছো যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।

অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্ব্বনাশা প্রেম তা র নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বাবম্বার ঝ'রে ঝ'রে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হ'তে।

এই কবিতাটির মধ্যে কবি একটি তত্ত্বকে উপভোগ করিতেছেন। তত্ত্বকে উপভোগ করিতে গেলে চাই রূপ,—তাই এখানে আমরা একটি রূপবান তত্ত্বকে পাইতেছি। অনন্তগতিশীল এই সৃষ্টি কবির চোখের সম্মুখে একটি উদ্দাম প্রচণ্ড গতিশীল 'বিরাট' নদীরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি এখানে তত্ত্বটিকেই রূপবান করিয়া তুলিয়া উপভোগ করিয়াছেন।

আবার ঐ 'বলাকার' মধ্যেই অপর একটি কবিতা পাই, যেখানে কবি সৃষ্টির এই চিরচঞ্চলতা, এই উদ্দাম গতিশীলতা অনুভব করিয়াছেন

একটি বিশেষ আবহাওয়ার সাহায্যে ; সেখানে সৃষ্টির এই চিরচঞ্চলতার রূপটি বিশেষ একটি অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে সহজে আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল,—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তা'র ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।
সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর রমণী,
গেল চলি' স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।

উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

এইরূপ একটি অনুকূল, সমধর্ম্মী আবহাওয়ার মধ্যে কবির মনে হইল, সমস্ত সৃষ্টি যেন ঐ ধাবমান অদৃশ্য বলাকার মত কোন্ এক অজানা লক্ষ্যের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধরে' চকিতে হইতে দিশেহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা!
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে' বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি,
হে পাখা-বিরাগী!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনো খানে!"

এমনি করিয়া কবি দুইভাবে তাঁর তত্ত্বকে রূপবান করিয়া তুলিতে পারেন,—তত্ত্বটিকে কোন একটি পরিচিত, সমধর্ম্মী বাস্তবরূপের

সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়া, অথবা এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া যাহার মধ্যে তত্ত্বটি আপনা হইতেই রূপবান হইয়া উঠিতে পারে।

একটি অপরিচিত লোক অপর একটি অপরিচিত লোককে হত্যা করিয়াছে, এই সংবাদটি কোনও সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া আমাদের মধ্যে আর যাহাই জাগিয়া উঠুক না কেন, রসানুভূতি যে জাগিয়া উঠে না—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, ইহা একটি সংবাদ মাত্র। কিন্তু এই ঘটনাটির চারিপাশে যেই একটি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়, অমনি তাহা রসবস্তু হইয়া উঠে। তখন আর আমরা এই সংবাদ বা ঘটনাটিকে কেবলমাত্র অবগত হই না,—ইহাকে অনুভবও করিতে থাকি। যেমন, যদি কেহ এক ভীষণ, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অন্ধকারময় রজনীর বর্ণনা করেন এবং তার পর বলেন, যে এ হেন দুর্য্যোগের রাত্রে পথে চলিতে চলিতে বিদ্যুতের চকিত আলোকে তিনি উক্ত হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হইতে দেখিয়াছেন, অমনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় সংবাদের রূপ ত্যাগ করিয়া রসরূপ ধারণ করিয়া বসে। তখন এই হত্যাকাণ্ডটির কথা আমরা কেবলমাত্র জ্ঞাত হই না,—ইহাকে আমরা অনুভব করি, ইহার ভীষণতা আমাদের চিত্তকে নাড়া দিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের উপরি উদ্ধৃত দ্বিতীয় কবিতাটির ভিতর দিয়া কবির মনের যে চিন্তাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা চিন্তাই থাকিয়া যাইত, যদি কবি তাহার চারিদিকে সমধর্ম্মী একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি না করিতেন।

আর এক ভাবেও এই হত্যাকাণ্ডটিকে রসরূপ দেওয়া যায়, তাহা উক্ত ঘটনাটিকেই রূপবান করিয়া তুলিয়া। একটি লোক অপর একটি লোককে হত্যা করিয়াছে, ইহা সংবাদ মাত্র। কিন্তু খুন করার ভীষণ ভঙ্গিটিকে কেহ যদি অনুরূপ কোন পরিচিত ভীষণ দৃশ্যের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলেন, তাহা হইলে এই হত্যাকাণ্ড ব্যাপারটি আর ঘটনা বা

সংবাদ মাত্রই থাকে না—রসবস্তু হইয়া উঠে। উপরি উদ্ধৃত ‘চঞ্চলা’ নামক কবিতাটির মধ্যে কবি এই দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন করিয়া তাঁর এই তত্ত্বটিকে রূপবান করিয়া তুলিয়াছেন।

বহির্জগতের কোন কার্য্য বা ঘটনা যেমন বিশেষ একটি রূপ বা আবহাওয়ার সাহায্য না লওয়া পর্য্যন্ত ঘটনাই থাকিয়া যায়—রসবস্তু হইয়া উঠিতে পারে না,—আমাদের মনোরাজ্যের চিন্তাগুলিও তেমনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিশেষ একটি রূপকে বা আবহাওয়াকে আশ্রয় করিয়া রূপবান হইয়া উঠে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা তত্ত্বই থাকিয়া যায়—রসবস্তু হইয়া উঠিতে পারে না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল কবিতার কথা বলিলাম, সেগুলির বিষয়বস্তু চিন্তাপ্রসূত বটে, কিন্তু কবি যখন তাহাকে লইয়া কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন, তখন তাহা চিন্তার রাজ্য ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষ জগতের একটি রূপবান ঘটনার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন ‘চঞ্চলা’ নামক কবিতাটির মধ্যে কবি সৃষ্টির অশ্রান্ত গতিবেগ অনুভব করিয়াছেন। সৃষ্টি যে অনন্ত গতিশীল, ইহা অনেক চিন্তা ও যুক্তির সাহায্যে মানুষ জানিতে পারিয়াছে। কবিও এই সত্যটিতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে হয়ত নিজের মনের মধ্যে অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন, অথবা অপর কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তির যুক্তিপরম্পরা অনুসরণ করিয়া ঐ সত্যে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি যখন কবিতা লিখিতে বসিলেন, তখন তাঁর মনের সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে, কবি অখণ্ড বিশ্বাসের সহিত এই সত্যটিকে উপলব্ধি করিয়া ফেলিয়াছেন,—বাকি রহিল কেবল ইহাকে উপভোগ করা, নিবিড় ভাবে অনুভব করা। ইহা একশ্রেণীর কবিতা, এবং এই শ্রেণীর কবিতার কথাই এতক্ষণ বলিতেছিলাম। ইহা ছাড়া আর

এক শ্রেণীর কবিতা 'বলাকার' মধ্যে পাওয়া যায়, যেগুলির মধ্যে কবি চিন্তাপ্রসূত সত্যকেই কেবল উপভোগ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই,—যে ভাবে বিপরীত ধারণা এবং বিশ্বাসের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তিনি এই সত্যে উপনীত হইতে পারিয়াছেন,—সেই বিপরীত ধারণাগুলিকেও তিনি এইসঙ্গে উপভোগ এবং অনুভব করিতে ছাড়েন নাই। আসল কথা, এই সকল কবিতার মধ্যে কবি শুধু চিন্তাপ্রসূত সত্যটিকেই রূপবান করিয়া তুলেন নাই,—চিন্তাপ্রণালীটিকেও যথাসম্ভব রূপ দান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন 'ছবি' নামক কবিতাটির মধ্যে কবি দুইটি বিপরীত সত্যকে পাশাপাশি বসাইয়া উপভোগ করিয়াছেন। স্বর্গীয় কোন প্রিয়জনের ছবি দেখিয়া কবির মনের মধ্যে প্রথমে প্রশ্ন উঠিল—এই যে চিত্রখানি, ইহা কি শুধুই প্রাণহীণ একটি পট মাত্র?—

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;
ওই যারা দিন রাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?

কবিতা লিখিবার সময় অবশ্য এ প্রশ্ন কবির মনে উঠে নাই,—কেন না, কবি ইতিমধ্যেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, সৃষ্টির মধ্যে কিছুই স্থির হইয়া নাই, ইহার অণুপরমাণু পর্য্যন্ত কোন এক অজানার

আহ্বানে ছুটিয়াছে। কিন্তু ইহা স্থির করিয়া ফেলিবার পরও কবির মনের মধ্যে কোনদিন হয়ত সন্দেহ উঠিয়াছিল—ঐ যে ছবিখানি, উহা ত কৈ চলিতেছে না, উহা ত স্থির হইয়া একই ভাবে রহিয়াছে, উহার ত গতিবৃদ্ধি নাই। কবি সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সমাধান করিয়া ফেলিলেন—

তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল ?
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাস বায়ু করে সুমধুর
ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি' রক্তে মোর দিয়াছো যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
'কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

এই যে প্রশ্নোত্তরের আকারে কবিতাটি গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার সহিত আমাদের মনের চিন্তার আকারের অনেকটা মিল আছে। আমাদের মনের চিন্তাধারাও অনেকটা এইভাবেই প্রবাহিত হয়। শুধু এই কবিতাটিতেই নয়, 'বলাকার' অন্তর্গত আরও অনেক কবিতার মধ্যেই কবি শুধু উপভোগ করেন নাই—চিন্তাও করিয়াছেন।

সৃষ্টির এই উদ্দাম গতিশীলতাই যে সত্য,—স্থির হইয়া থাকার মধ্যে যে কোন সত্য নাই, এই সত্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করিবার পর কবি ইহাকে রূপের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া অনায়াসে উপভোগ করিতে পারিতেন, যেমন তিনি 'চঞ্চলা' বা 'বলাকা' নামক কবিতার ভিতর দিয়া করিয়াছেন। কিন্তু কবির উপভোগের রীতি সকল সময় যে এক ভাবেরই হইবে এমন কোন কথা নাই।—কবির উপভোগের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবি আজকাল নিজের চিন্তাধারাটি পর্য্যন্ত উপভোগ করিতে চান। আসল কথা, কবি আজকাল চিন্তা করিতে আনন্দ পান; তাই তাঁর চিন্তা-পদ্ধতিটি পর্য্যন্ত আজকাল কবিতার মধ্যে রূপবান হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ আমরা 'বলাকার' ১৬ সংখ্যক কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। এই কবিতাটির মধ্যে কবি দস্তুরমত চিন্তা করিতেছেন। 'সাজাহান' কবিতাটিতেও তাই। এই কবিতাটির মধ্যে কবি বিপরীত দুটি চিন্তাকে কি ভাবে পাশাপাশি বসাইয়া দিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার জিনিষ।

কবিতাটি আরম্ভ হইয়াছে যে ধারণাকে আশ্রয় করিয়া,—শেষ হইয়াছে ঠিক তাহার বিপরীত ধারণা পোষণ করিয়া। কবি প্রথমে বলিলেন—সবই শেষ হইয়া গিয়াছে,—সে দিল্লীশ্বরও নাই, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দিল্লীরাজ্যও কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

চলে গেছো তুমি আজ
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্ন সম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে ;
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি 'পরে।

ইহার পর কবি বলিতেছেন—হে সম্রাট, সবই গিয়াছে, যায় নাই কেবল তোমার প্রিয়ার অক্ষয় স্মৃতি। তাজমহলের ভিতর দিয়া তাহা আজিও অমর হইয়া রহিয়াছে। সেই যে তোমার প্রেমের দূত তাজমহল, সে আজিও—

তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙা-গড়া,
তুচ্ছ করি' জীবন মৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগ যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

তাহার পর কবি বলিতেছেন—

মিথ্যা কথা—কে বলে যে ভোলো নাই ?
কে বলে রে খোল নাই
স্মৃতির মন্দিরদ্বার ?

* * *

জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
ত'ার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।

যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিলো নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধ'রেছে তব পায়ে,
দিয়েছো তা, ধূলিরে ফিরায়ে।

এই কবিতাটি এবং 'বলাকার' অন্তর্গত আরও অনেকগুলি কবিতার ভিতর দিয়া আমরা দেখিতে পাই, কবি শুধু তাঁর চিন্তাপ্রসূত সত্যটিকে মাত্র উপভোগ করেন নাই, তাঁর মনের চিন্তাপ্রণালীটিকে পর্য্যন্ত উপভোগ করিয়াছেন। তাই, এই সকল কবিতার মধ্যে কবির অনুভূতিই যে শুধু রূপ পাইয়াছে তাহা নয়—তাঁহার চিন্তাপদ্ধতিটি পর্য্যন্ত রূপবান হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জীবনের সহিত যে জিনিষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহাকে আমরা কেবল উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হইঁতে পারি, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জীবনের সহিত যে জিনিষটির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে শুধু কেবল উপভোগের খোরাক জোগাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, সেই সঙ্গে আমাদিগকে চিন্তা করায়—ভাবাইয়া তুলে।

এই যে সৃষ্টির গতিশীলতা কবি আজ উপলব্ধি করিতেছেন—ইহার সহিত কবির শুধু কেবল উপভোগের সম্বন্ধ মাত্র নয়—সেই সঙ্গে অন-

ক্ষিতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অতিবড় প্রত্যক্ষ চিন্তা আসিয়া যুক্ত হইয়া গিয়াছে,—সেটি কবির মৃত্যুভাবনা। কবি যে আজ সমস্তই গতিশীল দেখিতেছেন, ইহা শুধুই একটা তত্ত্বোপভোগ মাত্র নয়—ইহার সহিত কবির নিজের চলিয়া-যাওয়ার অদূর সম্ভাবনার দরদটুকু মিশিয়া রহিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, 'বলাকার' মধ্যে কবি শুধু কেবল সৃষ্টির অনন্ত গতিশীলতার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই,—সেই সঙ্গে নিজের চলিয়া-যাওয়ার কথাও তাঁহার মনের মধ্যে বার বার জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই সৃষ্টির এই অনন্ত পথ-চলার গতির সহিত কবি নিজের চলিয়া-যাওয়ার সুরটিকে যুক্ত করিয়া দিয়া গাহিয়াছেন—

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়,
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃত পানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।
ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস পিছে?
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রবো না ঘরের কোণে থেমে

*　　*　　*　　*

ওরে মন
যাত্রার আনন্দ-গানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

কবি যেন মৃত্যুভাবনার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। পরের কবিতাটিতে কবির এই সান্ত্বনা-খোঁজার চেষ্টা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কবি বলিতেছেন—

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হ'য়ে গেছে আজ আমার জীবন, আর
আমার ভুবন।
ভালো বাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো

ইহার পরই কবি বলিতেছেন—

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।

মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কানে কানে
রজনী ক'বে না তা'র রহস্যবারতা।
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এইখানেই কবির ব্যথা এবং এইখানেই কবিকে সান্ত্বনা খুঁজিতে হইয়াছে।

সমগ্র সৃষ্টি কোন্ এক অজানার আহ্বানে অনন্তকাল ধরিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিয়াছে—ইহা একটি তত্ত্ব। এই তত্ত্বটিকে কবি উপভোগ করিলেও ইহা তাঁহাকে কোনদিন ভাবাইয়া তুলে নাই। কিন্তু স্বয়ং কবিকেও একদিন এই অজানার আহ্বানে এই জগৎ ছাড়িয়া কোন্ এক অজানা রাজ্যে চলিয়া যাইতে হইবে, এই চিন্তা যখন তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইল, তখন তাহা আর তত্ত্বমাত্র রহিল না, এমন কি রসবস্তু হইয়া উঠিয়াও ক্ষান্ত থাকিল না, তাহা তখন হইয়া উঠিল একটি প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ব্যাপার, যাহা তাঁহার চিত্তকে রীতিমত নাড়া দিয়া গেল। এ অবস্থায় মানুষ একটা সান্ত্বনা খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়ে। তাহা না হইলে এতবড় সর্ব্বনাশটাকে সে মনে মনে বরদাস্ত করিবে কিরূপে ?—তখন কবিকে বলিতে হয়—

এমন একান্ত ক'রে চাওয়া
এও সত্য যত

এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনো খানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এতবড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হ'য়ে যেতো কালো।

'বলাকার' আর একটি কবিতায় কি আকুল আগ্রহে কবি মৃত্যুর মধ্যে সান্ত্বনা অনুসন্ধান করিয়াছেন—

দূর হ'তে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

*  *  *

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর ?"
এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্তরবে
ঘুম হ'তে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না তা কেউ
রাত্রি আছে কিনা আছে ; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ ;

তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী,—
"নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি
বাহিরিয়া এ'ল কা'রা ? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।

কবি তখন আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিতেছেন-

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মিলে দুঃখ সাথে যুঝে,

*  *  *  *

তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিবে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো ?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

এই সান্ত্বনা বুকে করিয়াই কবি তাঁর মহাযাত্রার আসন্ন মুহূর্ত্তটিকে

বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন। এই সান্ত্বনাটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই ঠিক পরবর্ত্তী কবিতাটিতেই কবি বলিতেছেন—

আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি'
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে আজি
পারের তরী থাকুক্ ভাসিতে।
যাবার হাওয়া ঐ যে উঠেছে,—ওগো
ঐ যে উঠেছে
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম যে ছুটেছে।
হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে,
কেগো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

সৃষ্টির অনন্ত গতিবেগ যদি শুধুই একটা তত্ত্বমাত্র হইত, যাহার সহিত কবি হিসাবে তাঁহার সম্পর্ক কেবল মাত্র বাহির হইতে উপভোগ করার, তাহা হইলে কবি শুধু এই অশ্রান্ত গতিবেগটিকে দূর হইতে দেখিয়া এবং উপভোগ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ পাইতে পারিতেন। কিন্তু মহাযাত্রার পূর্ব্বক্ষণে জীবনের শেষসীমানায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কবি এই তত্ত্বটিকে শুধু কেবল বাহির হইতে উপভোগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ইহার একটা মীমাংসা না করা পর্য্যন্ত তাঁহার মন আজ আর কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছে না। আজ ইহা

শুধু একটা তত্ত্বমাত্র নয়,—ইহার সহিত তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নিবিড় একটা সম্বন্ধ তিনি আজ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন।

তাই, সৃষ্টির এই অশ্রান্ত গতিবেগ কবিকে কেবল মাত্র মুগ্ধ করে নাই —ইহা তাঁহাকে রীতিমত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।

ওরে কবি তোরে আজি করেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন-মেখলা।

এই গতিবেগ শুধু সৃষ্টির মূলকেই আলোড়িত করিতেছে না,—কবির বর্ত্তমান জীবনের ভিত্তিমূলেও রীতিমত নাড়া দিয়াছে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর
তরণী কাঁপিছে থর্ থর্।
তীরের সঞ্চয় তোর প'ড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস্ নে ফিরে'!
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

জীবন-নদীর তীরে দাঁড়াইয়া কবি আজ আর একথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না, যে এ জীবন অনন্তকাল ধরিয়া কেবল চলিতেই থাকিবে। আজ শুধু কেবল গতির আনন্দই কবিকে মুগ্ধ করিতে পারিতেছে না,—কবি আজ এই গতির বাহিরের একটি স্বতন্ত্র সার্থকতার অনুসন্ধান করিতেছেন।—ইহা ত আজ কবির নিকট শুধুই একটা

তত্ত্বমাত্র নয়। ইহার সহিত যে আজ তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক চিন্তাই সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র সার্থকতার সন্ধান না করিয়া কবি আজ আর নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না —তাই এই গতির বাহিরে তিনি আজ একটি লক্ষ্যের সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কোন লক্ষ্য যদি না থাকে, তাহা হইলে এই গতির যে কোন সার্থকতাই থাকে না। তাই কবি সৃষ্টির এই অশ্রান্ত গতিবেগকেই আজ আর সর্ব্বস্ব বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছেন না,—আজ তাহার সহিত তিনি আর একটি সার্থকতা জুড়িয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন। কবি বলিতে চান—"গতিই সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র সত্য নয়। সৃষ্টি শুধুই কেবল চলিতেছে না—চলার সঙ্গে সঙ্গে সে এই চলা হইতে মুক্তির সন্ধানও পাইতেছে। এই যে চলার গতিবেগ এবং তাহা হইতে মুক্তির জন্য বাসনা, এই দুটি চেষ্টা মিলিয়া সৃষ্টিকে সম্পূর্ণতা দান করিতেছে। সৃষ্টি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে, ইহা একটি অর্দ্ধসত্য মাত্র,—ইহার অপরার্দ্ধে রহিয়াছে গতি হইতে মুক্তির আশ্বাস। এই দুইটি অর্দ্ধসত্য মিলিয়া একটি অখণ্ড সত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই অখণ্ড সত্যই সৃষ্টির মূলে বর্ত্তমান। সৃষ্টির মধ্যে গতিই যদি সর্ব্বস্ব হইত, তাহা হইলে এই যে পৃথিবীর এত ভালবাসা, এত স্নেহ, মমতা, প্রেম, স্বার্থত্যাগ, সৌন্দর্য্যমুগ্ধতা, ইহাদের মূল্য কোথায় থাকিত? এই যে মাতার ভালবাসা, পত্নীর প্রেম, এই যে বীরের আত্মত্যাগ,—ইহাদের কি কোন মূল্য নাই?—

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?

তাই কবি সৃষ্টির মূলে দুইটি সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন,—একটির নাম দিয়াছেন 'উর্ব্বশী' অপরটির নাম দিয়াছেন 'লক্ষ্মী'।

ইহাদের একজন—

তপোভঙ্গ করি'
উচ্চ হাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
যে যায় প্রাণমন হরি',
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে ;
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে

অপরটি—

ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিত হাস্য সুধায় মধুর
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন মৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থ তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

'বলাকা' হইতে 'পূরবীতে' আসিয়া কবি সৃষ্টির এই গতিবেগটিকে শুধু কেবল তত্ত্ব হিসাবে উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বিশিষ্ট একটি অনুভূতির সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিয়া একান্ত নিজস্ব করিয়া তুলিয়াছেন। 'বলাকার' মধ্যেই ইহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, 'পূরবীতে' আসিয়া ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'বলাকার' মধ্যে যে গতিবেগ একটি সার্ব্বজনীন সত্য ছিল, 'পূরবীতে' আসিয়া তাহা কবির নিজস্ব জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়া একটি বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। 'বলাকা' আমাদিগকে বিস্মিত করে, চমৎকৃত করে, স্তম্ভিত করে, 'পূরবী' আমাদিগকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে, আমাদের অন্তরকে দ্রবীভূত করিয়া দেয়, আমাদের চিত্তকে অশ্রুসজল করিয়া তুলে।

ধরণী হইতে বিদায় লইবার করুণ, অতিকরুণ মুহূর্ত্তটি কবি যতই কল্পনায় চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে দেখিতেছেন, ইহাকে ততই নিবিড়ভাবে শেষবার বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

'পূরবীর' মধ্যে তাই দুইটি সুর পাশাপাশি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে,—একটি বিদায়ের সুর, অপরটি ধরণীর অসংখ্য মধুর স্মৃতিগুলিকে শেষবার আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যাকুলতার সুর। তাই, বিদায়বেলার বিষাদময় ক্ষণটির করুণ সুর যেমন একদিকে 'পূরবীর' অনেকগুলি কবিতাকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিয়াছে, অপরদিকে তেমনি, ধরণীর অসংখ্য বিচিত্র বস্তু, যাহাদিগকে কিছুদিন পরে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাদের অসংখ্য অতীতস্মৃতি আজ কবির মনের মধ্যে একটি স্বপ্ন-মাদকতার সৃষ্টি করিয়াছে। ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ধরণীর এই সকল অসংখ্য স্নেহবন্ধন আজ কবির নিকট দুর্লভ বলিয়া মনে হইতেছে।

'পূরবীর' প্রথম কবিতাটিতেই কবি বলিতেছেন—

> যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
> আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
> যাদের আলো-ছায়ার লীলা ; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
> নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝরণা নিলো তুলি' ;
> তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেইতো আমার আয়ু,
> নাই সে কেবল দিনগণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাস বায়ু।
> তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে ;
> নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানাদিনের সুধার রসে পূরে ;

এই যে 'আপন মানুষগুলি,' ইহাদের অনেককেই কবি হারাইয়াছেন। আজ এই বিদায়ক্ষণে, তাহাদের স্মৃতি কবির মনের মধ্যে বারবার জাগিয়া উঠিতেছে। তাহারা যে কত দুর্লভ ছিল, তাহা কবি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিতেছেন—তাই আজিও যাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি কবির কি অগাধ মমতা !

* * * *

> তাই যারা আজ রইলো পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়
> তাদের হাতে হাত দিয়ে 'তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
> বলে নে ভাই এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো !
> এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায়
> ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
> এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
> পুণ্যধরার ধূলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।

মাটির এই পৃথিবীকে কবি চিরদিনই ভালবাসিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু বিদায় লইবার পূর্বে কবির নিকট ইহা দুর্লভ এবং অপূর্ব বলিয়া মনে হইতেছে। আজ আর পৃথিবীকে নূতন করিয়া ভোগ করিবার সময় নাই, আজ ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে কবির মনের মধ্যে কেবল পূর্বস্মৃতিসকল জাগিয়া উঠিতেছে। এই যে মা-বসুন্ধরার স্নেহকরস্পর্শলাভ, ইহা ছাড়া জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা কবির নিকট অলীক এবং মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহার আজ মনে হইতেছে, জীবনের অসংখ্য বাজে কাজে সময় নষ্ট না করিয়া মা-ধরণীর এই স্নেহস্পর্শ আরো নিবিড় করিয়া, আরো বেশি করিয়া প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া লন নাই কেন?

কার কথা এই আকাশ বেয়ে ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
যে জননীর কোলের পরে জন্মেছিলি মর্ত্ত ঘরে,
প্রাণভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হ'তে তোরে কে এনেছে হরণ ক'রে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান্ পাকে।
বাঁধন ছেঁড়া তোর সে নাড়ী সইবে না সে ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে
শুনে আমি ভাবি মনে, তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাইতো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে "গেছিস দূরে অনেক দূরে",
কি যেন তাই চোখের পরে ঢাকা।

এমনি করিয়া ধরণীর বিচিত্র অনন্ত স্মৃতি যখন কবির মনটিকে অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে জড়াইয়া ধরিতেছে, তখন অপর দিকে, মহাযাত্রার বিরাট

আহ্বান কবিকে উতলা করিয়া তুলিতেছে। তাই কবি যেমন একদিকে অনুভব করেন—

আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে  নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ তলায়,  তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইলো ব্যবধান।
যে সব অতিথি পবন-পারের  আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাহির দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েছে খোলাখুলি  তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কি ভুল ভুলে ছিলেম আহা,  সব চেয়ে যা নিকট, তাহা
সুদূর হয়েছিল এতোদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—  চারিদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরলো উদাসীন।

তেমনি আবার অপর দিকে 'আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরেপড়া' মৃত্যুগামী অসংখ্য শিউলি ফুল কবিকে ডাকিয়া বলে—

… কবি
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনা-সভায়,
যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য; যেথায় নিঃশব্দ বেণুপরে
সঙ্গীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে?

এমনি করিয়া জীবনের অপরাহ্ণবেলায় পৃথিবীর স্নেহবন্ধন তাঁহাকে যেমন একদিক হইতে পিছনের দিকে টানিতেছে, অপর দিকে তেমনি, কোন্ এক অজানার আহ্বান তাঁহাকে সম্মুখের পানে ক্রমাগত ডাকিতেছে।

তাই 'পূরবীর' মধ্যে এক শ্রেণীর কবিতা আমরা পাই, যেখানে কবি তাঁর জীবনের শেষ কয়টি মুহূর্ত এই মাটির পৃথিবীর স্নেহ দিয়া ভরিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আর এক শ্রেণীর কবিতা পাই, যেখানে এই ধরণীর অসংখ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন্ এক অজানা রাজ্যে চলিয়া যাইবার জন্য কবির ডাক আসিয়াছে।

মা-ধরণীর অসংখ্য স্নেহ-স্মৃতি আজ এই বিদায়ক্ষণে কবির মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। অতীতের এই সকল মধুর স্মৃতি আজ এই বিদায়বেলায় কবির নিকট স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।

ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেতো মোর বাতায়নে এসে,
কখন আমের নব মুকুলের বেশে,
কভু নব মেঘ ভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছো বারে বারে
নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা শেষের গগন কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোণায় সোণায়
ছুঁয়ে গেছো থেকে থেকে।

কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

অতীতের এই সকল সুখস্মৃতি কবিকে আবার তাঁর গতজীবনের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু আর সময় নাই, বিদায়বেলায় পিছু ডাকিয়া ফল কি?

দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায় সারা হ'য়ে এলো দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।
এতদিন আমি ছিনু হেথা পরবাসী,
হারায়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজি, সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বসি গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছো খেলায়, সারা হয়ে এলো দিন।

তাই সুন্দরী এই বসুন্ধরার অসংখ্য বিচিত্র স্মৃতি কবিকে যখন মশগুল করিয়া তুলে—তখন সহসা—

নবীন পল্লবপুটে মর্ম্মরি মর্ম্মরি উঠে
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস;
ঊষার সীমন্তে লেখা উদয় সিন্দূর রেখা
মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।
আম্রের মুকুল-গন্ধে ব্যাকুল কী সুর
অরণ্য ছায়ার হিয়া করিছে বিধুর;
অশ্রুর অশ্রুত-ধ্বনি ফাল্গুনের মর্ম্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

কবি বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁর মানসী-প্রিয়াকে বলিতেছেন—

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলে ছিনু তাই।

হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গণিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সঙ্কোচ ভরে বসন্ত-শেষের দিন মম॥

* * * * *

ফিরিয়া যেয়োনা, শোনো শোনো,
সূর্য্য অস্ত যায়নি এখনো।
সময় র'য়েছে বাকি ;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হ'তে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধ'রে ঝলুক তোমার কালো কেশে॥

* * * * * *

তাহার পর—

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাবো প্রিয়ে,
সুমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী॥

---